আর্সেনিক

প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত

এডুকেশন ফোরাম
স্টল ৪১, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা ৭৩

ARSENIC
Popular Science writing by Pradip Kumar Sengupta, Published by Education forum, Kolkata 73
ISBN: 81-87657-50-2
Price: Rs. 45.00

© শ্যামলী সেনগুপ্ত

প্রথম সংস্করণ ঃ কলকাতা বইমেলা ২০০৪
প্রচ্ছদ ভাবনাঃ শিঞ্জন সেনগুপ্ত
প্রচ্ছদ ঃঅনুপম গিরি
I S B N: 8 1-8 7 6 5 7-50-2
এডুকেশন ফোরামের পক্ষ থেকে স্টল ৪১, ভবানী দত্ত লেন, কলকাতা-৭৩ থেকে আজিজুল হক
কর্তৃক প্রকাশিত, বর্ণ সংস্থাপনে শ্রীমা গ্র্যাফিক্স, ব্রহ্মপুর এবং
ঊষা প্রেস, ৩২এ শ্যামপুকুর স্ট্রিট, কলকাতা-৪ হতে মুদ্রিত
পঁয়তাল্লিশ টাকা

শুনহে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই
- চন্ডীদাস

ভূমিকা

ভূগর্ভের জলে আর্সেনিক আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয় বিশ্বের বহু দেশেই এক বিশাল সমস্যা। এর মোকাবিলা এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আজ বহু সংগঠন এর তথ্যসন্ধান, গবেষণা ও মোকাবিলায় নেমে পড়েছেন। কিন্তু ইপ্সিত ফল এখনও লাভ হয়নি। এর প্রধান কারণ দূষণের বিশাল ব্যাপ্তি, দারিদ্র এবং অজ্ঞতা । এ ছাড়া আর্সেনিক নিয়ে সর্বস্তরের সচেতনতা এখনও আসেনি। এখনও কোথও কোথাও মানুষ তার অজ্ঞতা থেকে আর্সেনিক যুক্ত পানীয় জল ব্যবহার করছেন আবার কোথাও বা অযথা আতঙ্কে ভুগছেন। আজ পশ্চিমবঙ্গে আটটি জেলার একাশিটি ব্লকে ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। কলকাতায়, বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতার কিছু অংশে নলকূপের জলে বিপজ্জনক মাত্রার থেকে অনেক বেশী পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলা আর্সেনিক আক্রান্ত।

লেখক শ্রী প্রদীপ কুমার সেনগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জল অনুসন্ধান অধিকারের একজন বরিষ্ঠ ভূতাত্ত্বিক। রাজ্য জল অনুসন্ধান অধিকার ১৯৭৮ সাল থেকেই আর্সেনিক নিয়ে তথ্য অনুসন্ধান করছেন। পশ্চিমবঙ্গে ভূগর্ভস্থ জলে প্রথম ফ্লোরাইড ও আর্সেনিকের সন্ধান এই দপ্তরই পেয়েছেন। আজ সারা বাংলা জুড়ে দু হাজার সমীক্ষা কুপ থেকে বছরে চার বার ভূগর্ভস্থ জলের গভীরতার মাপ নেওয়া হয় ও বছরে দুবার তার রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষার জন্য চারটি জেলায় চারটি আঞ্চলিক পরীক্ষাগার ও কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় পরীক্ষাগার আছে। মালদহে আর একটি পরীক্ষাগার চালু হতে চলেছে। এ ছাড়া রয়েছে একটি ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগার, যা দূরতম গ্রামে গিয়েও জলের রাসায়নিক পরীক্ষা করতে পারে। আর্সেনিকের সন্ধানে রাজ্য জল অনুসন্ধান অধিকার হাওড়া, হুগলি ও বর্ধমান জেলায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আর্সেনিকের সমীক্ষা করেছেন। কলকাতার জলে আর্সেনিক নিয়ে এই দপ্তর থেকে নিরন্তর সমীক্ষা হয়।

আর্সেনিক নিয়ে সারা বিশ্বে উদ্বেগের সীমা নেই। বিশেষ করে এই উপমহাদেশের গাঙ্গেয় সমভূমিতে আর্সেনিক দূষণের যে ব্যাপ্তি তার তুলনা একমাত্র কোনও ভয়াবহ প্রকৃতিক বিপর্যয় বা কোনও মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা। বলা চলে প্রকৃতির এই প্রতিশোধ, এই দূষণ তার চেয়েও অনেক বেশী ভয়ঙ্কর, কারণ এ যে কত দশক ধরে মানব সমাজ কে চ্যালেঞ্জের সামনে ফেলে রাখবে তা কেউ জানেনা।

আজকে যেমন ক্যানসার একটা বড় সমস্যা। ক্যানসারের সত্যিকারের কারণগুলো আবিষ্কৃত হলে এতদিনে নিশ্চয়ই তার সমাধান ও নির্দিষ্ট ওষুধ বের হয়ে যেত। ঠিক তেমনই ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক কিভাবে এলো তা নিশ্চিতভাবে এখনও আবিষ্কার করা যায়নি। তা হলে আজ তার সমাধান আমাদের হাতে এসে যেত। দেশে বিদেশে জল থেকে আর্সেনিক দূরীকরণের

নানা প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু তারও অনেক সমস্যা আছে, বিশেষ করে তার থেকে যে বর্জ্য পদার্থ উৎ পন্ন হয় তা নিয়ে। লেখক এই বইয়ে দেশ বিদেশ থেকে নানা তথ্য সন্নিবিষ্ট করে আর্সেনিকের উৎপত্তি ও তার মোকাবিলার জন্য নানা উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিজ্ঞান পিপাসূ মানুষেরা এই বই থেকে অনেক তথ্য পাবেন। সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যও এই বই কাজে লাগবে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরও বিতর্ক চলবে বলে আশা রাখি।

লেখক আর্সেনিক আক্রান্ত জেলাগুলিতে বহুদিন সলিলভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা করেছেন। বাংলায় অনেক মননশীল বিজ্ঞান প্রবন্ধ তিনি লিখেছেন। কালান্তর পত্রিকাতেও তাঁর কিছু বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইয়ে তিনি সারা পৃথিবীতে আর্সেনিক নিয়ে যে সব কাজ হয়েছে তার থেকে তথ্য সংকলিত করেছেন। পরিশিষ্টে আর্সেনিক সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের একটি তালিকা সংযুক্ত করে এই বইয়ের পাঠককে আরও তথ্য পেতে সহায়তা করেছেন। বাংলার মানুষকে বাংলা ভাষায় আর্সেনিকের স্বরূপ বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন ছিল। এই বই থেকে সেই অভাব খানিকটা পুরণ হবে বলে আশা রাখি।

মহাকরণ
কলকাতা ১১ই ডিসেম্বর ২০০৩
.

শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
রাজ্য জল অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তর

লেখকের কথা

ভূতাত্বিক হওয়ার শখ আমার কবে জন্মেছিল ঠিক মনে নেই। দুটো বই ছেলেবেলায় আমাকে আকৃষ্ট করেছিল পাহাড়ে, পর্বতে, বনে-গুহায় ঘুরে বেড়ানোর জীবনে। সে দুটো বই হল আবার যখের ধন ও চাঁদের পাহাড়। দুটোই ছিল এ্যাডভেঞ্চারে পরিপূর্ণ। ছেলেবেলার কল্পনার ঘোড়াকে লাগাম ছাড়া হয়ে দৌড় করানোর সব রকম প্রশ্রয় ছিল তাতে। এর মধ্যে চাঁদের পাহাড়ই বোধ হয় আমাকে ভূতাত্বিক হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল।

ভূতাত্বিক হিসাবে চাকরী নিয়ে আমাকে জলের সাথে ঘর করতে হল। জল যে জলের মত সরল নয় কিছুদিনের মধ্যেই তার উপলব্ধি হল। দেখলাম কোথাওবা মানুষ জলের জন্য হাহাকার করে আবার কোথাও অফুরন্ত জলের সম্ভারের মধ্যে বসে জল সম্পর্কে উদাসীন।

সত্তরের দশকের শেষের দিকে সেচের নলকূপের সফলতা সারা বাংলায় সবুজের বান ডেকে দিল। এই কাজের সাথে যুক্ত হয়ে নিজেদেরকে সার্থক মনে হত। মনে হত নাইবা গেলাম চাঁদের পাহাড়ে হিরের খনির খোঁজে। বরং একটা নলকূপ সফল হয়ে আফলা জমিতে ফসল ফলাচ্ছে এ দেখে মনে অন্য এক তৃপ্তি জন্ম নিত। এ যেন আমাদেরই সফলতা। আমরাই তো খুঁজে বের করেছি মাটির বুকের মাঝে বন্দী যে জল।

আশির দশকের মাঝামাঝি বাতাসে কানাকানি, জলে আর্সেনিক। তখনও তার স্বরূপ কেউ জানত, বেশীরভাগই জানতনা। মুর্শিদাবাদের রানীনগরে প্রথম আর্সেনিক আক্রান্ত এক যুবতীকে দেখেছিলাম। সারা শরীরে কালো ছিট। বিয়ে ঠিক হয়ে ভেঙ্গে গিয়েছে, কারণ, আর্সেনিক তার রূপ কেড়ে নিয়েছে। এ যেন রূপকথার সেই দুষ্টু মেয়ে, রূপপুকুরে দুবার ডুব দিয়ে কুরূপা হয়ে গিয়েছে। আজ দুই বাংলার ঘরে ঘরে আর্সেনিকের অসুখে ভুগছে মানুষ। এই ভোগান্তির পেছনে আছে মানুষের প্রকৃতিকে অতিশোষণের প্রতিক্রিয়া, অশিক্ষা ও আচেতনতা। যে চেতনা নিজেকে ও সমাজকে সুস্থ রাখতে, স্বাস্থ্যের বিধি নিয়ম, প্রকৃতির বিধি নিয়ম মেনে সাবধানে চলতে শেখায় তার অভাব আজ মূর্তিমান বিভিষিকা হয়ে উঠেছে।

আর্সেনিক ভূগর্ভের জলে পাওয়া যাওয়ার পর হতেই বিভিন্ন সংগঠন ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতদিনে বঙ্গভূমির নিরুত্তাপ জলে তরঙ্গ উঠেছে। সেই তরঙ্গে অনেকে তরি ভাসালেন সত্যিকারের সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে দুর্গত মানুষের ত্রাণে। কিন্তু সমস্যা এত দুরূহ যে এখনও আমরা বলতে পারছিনা সত্যিই কোনও সমাধান আমাদের খুব নিকট ভবিষ্যতকে আলোকিত করতে পারবে। কিন্তু মানুষ হার মানেনা এটাই সবচেয়ে বড় সত্য।

আমার এই বই লেখার প্রেরণা আমার বন্ধুবর্গ। সত্যিই এই বই লেখার অধিকার আমার আছে কিনা জানিনা। কিন্তু এখানে আমি যা লিখেছি তার অতি সামান্যই আমার নিজস্ব। বেশীটাই আমি বিভিন্ন সেমিনারের পেপার, ওয়েবসাইট ও বই থেকে নিয়েছি। তাই তথ্যসূত্র একটু বিস্তৃত।

আমার এই কাজে আমার সহকর্মী অমিতাভ সেনগুপ্ত জলে আর্সেনিক নিরীক্ষণ ও রাসায়নিক পরীক্ষার বিভিন্ন দিক গুলো লিখতে আমাকে সাহায্য করেছেন। রাজ্য জল অনুসন্ধান ও উন্নয়ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী শ্রী নন্দগোপাল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই বইয়ের ভুমিকা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। ডঃ শাশ্বতী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী উৎপল নারায়ণ সরকার ও শ্রীমতী শ্যামলী সেনগুপ্ত বইয়ের প্রুফ সংশোধন করে একটি পীড়াদায়ক কাজ থেকে আমাকে অব্যহতি দিয়েছেন।

এই বই লেখার কারণ আমি মনে করেছি আর্সেনিক নিয়ে অহেতুক ভুল ধারণা পোষণ না করে সকলের এর প্রকৃত পরিচয় জানা দরকার। ধাতু ও অধাতুর সন্ধিপথে দাঁড়িয়ে এই মৌলটি ঐতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের জীবনে যে প্রভাব ফেলে চলেছে তাকে সকলের সামনে তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য।

প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত

সূচী

গোড়ার কথা ১১

মানুষ ও প্রকৃতি
আর্সেনিকের ইতিহাস
আর্সেনিকের রসায়ন
আর্সেনিকের ভূতত্ত্ব

পরিবেশে আর্সেনিক

মানুষের ভূমিকা
প্রাকৃতিক পরিবেশে আর্সেনিক
খাদ্য ও ফসলে আর্সেনিক

আর্সেনিক চক্র

ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক
পশ্চিমবঙ্গে সন্ধান
ভারতের অন্যত্র
আর্সেনিকের কবলে বাংলাদেশ
বিশ্বজোড়া আর্সেনিকের ফাঁদ
পশ্চিমবঙ্গে ভূতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

আর্সেনিক থেকে অসুখ

জলবাহিত আর্সেনিক থেকে রোগ

আর্সেনিকের মোকাবিলা
জলকে আর্সেনিক মুক্ত করা
আর্সেনিক ফিল্টারের বর্জ্য
আর্সেনিক টেকনোলজি পার্ক
সমীক্ষা
চিকিৎসা
বিকল্প উৎস
জন সচেতনতা

সামাজিক সমস্যা

পরিশিষ্ট

কলকাতার আর্সেনিক
আর্সেনিকের ওয়েবসাইট
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ
তথ্যসূত্র
পরিভাষা

গোড়ার কথা

মানুষ ও প্রকৃতি

পৃথিবীতে মানুষ এসেছে বিবর্তনের একেবারে শেষ ধাপে। মানুষের মত একটি উন্নত প্রাণকে লালন করার জন্য এই ভূমাকে বহুদিন ধরে প্রস্তুতি নিতে হয়েছিল। এই প্রস্তুতি পর্বে দুটি বিবর্তন কাজ করেছিল। একটি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠের ভূপ্রাকৃতিক বিবর্তন, যার ফলে আজকের এই ভৌগোলিক পরিবেশ গঠিত হয়েছে। আর একটি হল প্রাণের বিবর্তন। এককোষী থেকে আজকের উন্নত মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষে বিবর্তন ঘটাতে প্রকৃতিকে যে কত জেনেটিক এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়েছে তার শেষ নেই। এই গবেষণায় কত শত শত জীববৈচিত্র্য যে অবলুপ্ত হয়েছে তারও শেষ নেই। এই দুটি বিবর্তনই ঘটেছে একটি প্রধান বস্তুর বা প্রাকৃতিক সম্পদের উপস্থিতি ও সহায়তায়। তার নাম জল।

মানুষ আসবে এই কথা ভেবে পৃথিবী বহু আগেই মানুষকে বিশুদ্ধ পানীয় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। তাই প্রাকৃতিক জলচক্রের মত একটি অসাধারণ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল প্রকৃতির নিয়মেই। এই জলচক্র একদিকে যেমন প্রাণের প্রবাহকে সচল রাখতে ভূপৃষ্ঠে জলের যোগান দিয়ে চলে, অন্য দিকে দুটি জলশোধন প্রক্রিয়া এই জলচক্রের মাধ্যমে ঘটে থাকে। সমুদ্র ও জলপৃষ্ঠের থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে জলের পরিশোধন ঘটে থাকে এবং আমরা বৃষ্টিধারার থেকে বিশুদ্ধ জল পাই। এই জলেরই একটা অংশ ভূগর্ভে প্রবেশ করে সেখানে ভূসলিলাধারে সঞ্চিত হয়। এই ভূগর্ভে সঞ্চিত হওয়ার সময় জল আরও একবার পরিশুদ্ধ হয় ফিলট্রেশন প্রক্রিয়ার দ্বারা।

আজ থেকে বেশ কয়েক হাজার বছর আগে মানুষ তার যাযাবর জীবন যাত্রার থেকে এক ধাপ এগিয়ে স্থায়ী বাসস্থান তৈরী করে বাস করতে শুরু করে। সে যুগে মানুষের এই জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটেছিল শুধু একটি কারণে। মানুষ আবিষ্কার করেছিলো শুধু অরণ্য থেকে বা শুধুমাত্র প্রকৃতির কাছে হাত পেতে সে তার ক্ষুধা মেটাতে পারে না। তাকে মাটির থেকে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য জন্মানোর প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে হবে। সে আবিষ্কার করেছিলো, মাটিতে বীজ বপন করলে একটা নির্দিষ্ট কালচক্রের মধ্যে সেই বীজ থেকে শস্য জন্মায়। কিন্তু প্রতি নিয়ত সেই শস্য জন্মানোর জন্য মাটির ওপর তার অধিকার থাকা প্রয়োজন। সেই অধিকারের প্রয়োজনেই সে ঘর বানিয়েছিলো, কৃষিকাজ আরম্ভ করেছিলো।

তারপর বহুকাল কেটে গেছে। আধুনিক মানুষ সেই কৃষিকে অনেক উন্নত করেছে। কিন্তু এই উন্নতির মূল সোপান হচ্ছে প্রয়োজন মত শস্য ক্ষেতে জলের যোগান রাখা। জল বিশ্বের সমস্ত জৈব বস্তুর প্রধান জীবনদায়ী রসায়ন। এই জলকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে সভ্যতা, গড়ে উঠেছে নগর, গড়ে উঠেছে মানুষের কৃষ্টি। মানুষ জলকে ব্যবহার করে বহুভাবে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে কৃষিকাজ, পানীয় জল, কলকারখানা, জলপথ, ও নান্দনিক। জলকে

মানুষ যতদিন তার স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে ব্যবহার করেছে ততদিন জল তার জীবনদায়ী রূপকে অক্ষুন্ন রেখে মানুষের পরম

কল্যাণ সাধন করে এসেছে। জলকে মানুষ পেয়েছে আকাশ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টিধারায়, বয়ে চলা নদীর স্রোতে, সাগরে, পর্বতের চূড়োয় বা মেরু প্রদেশে তুষার রূপে, আর সব শেষে ভূগর্ভে। নগর সভ্যতা শুরু হওয়ার সাথে সাথেই মানুষ সম্ভবতঃ ভূগর্ভের জলের দিকে হাত বাড়িয়েছিলো। তার প্রথম ও প্রধান কারণ ছিলো পানীয় জলের প্রয়োজন মেটানো। বহুকাল পর্যন্ত ভূগর্ভের জল প্রধানতঃ সেই সব অঞ্চলে জলের যোগান দিতো যেখানে সারা বছর জল দেওয়ার মত নদী নালা বা পুকুর ছিলোনা। বাংলার মত নদীনালা খাল বিল পুকুরে সমৃদ্ধ এলাকায় কূপ বা নলকূপের আগমন অনেক পরে।

বিংশ শতকের শুরু থেকে একদিকে যেমন কলকারখানার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলো সেই সাথে মানুষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হল প্রচুর খাদ্য উৎপাদনের। শুধু আকাশ থেকে ঝরে পড়া বৃষ্টির ওপর ভরসা করে এই খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো যায়না। তাই দরকার হল নতুন করে সেচের পরিকল্পনার । দরকার হল বছরে বারোমাস ক্ষেতে ফসল ফলানোর। এর ফলে জলের যোগান বাড়ানোর জন্য জলের অন্যান্য উৎসগুলির দিকে মানুষের হাত পড়ল। নদী থেকে জল উত্তোলন করে, বাঁধ দিয়ে জলস্রোতকে প্রয়োজন মত অন্যধারায় প্রবাহিত করে কৃষি জমিতে সেচের ব্যবস্থা হল। কিন্তু সেই জলের যোগান সর্বত্র সহজলভ্য না হওয়ায় ভূগর্ভের জলের ভান্ডারে মানুষের হাত পড়ল। এতকাল মানুষ কেবলমাত্র পানীয় জলের জন্যই ভূগর্ভের জল উত্তোলন করত। কিন্তু বিংশশতকের মধ্যভাগ পেরিয়ে সবুজ বিপ্লব ঘটানোর জন্য গভীর ও অগভীর নলকূপের ব্যবহার শুরু হল।

আমাদের বাংলা দেশের মত খাল বিল ভরা এলাকায় মানুষ বহুকাল ধরেই পানীয় জল হিসাবে নদী বা পুকুরের জলকে ব্যবহার করত। এই নদী বা পুকুরের জল হয়তো কোনও এক কালে তুলনামূলক ভাবে বিশুদ্ধ ছিল। কিন্তু একই পুকুর বা নদীর জল আরও নানা কাজ যেমন স্নান, বাসনমাজা, গরু মোষ স্নান করানো ইত্যাদি কাজেও ব্যবহৃত হত। তার ফলে প্রায়ই এই জল দূষিত হয়ে যেত। ফলে, যখন জলবাহিত রোগ মহামারীর আকার ধারণ করত তখন গ্রাম কে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত। এই জন্য এক সময়ে এই জলকে ফিল্টার করে বা ফুটিয়ে খাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু জলকে বিশুদ্ধকরণের জন্য যেমন অর্থব্যয়ের প্রয়োজন তেমনই দরকার মানুষের সচেতনতা এবং শিক্ষার। এই দুটো জিনিষের অভাব আমাদের গ্রামের মানুষের মধ্যে বহুকাল ধরেই ছিলো এবং এখনও কোথাও কোথাও আছে।

এর থেকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য পানীয় জল হিসাবে ভূগর্ভের জল ব্যবহার শুরু হল। দেখা গেল পাতকূয়োর জলের থেকে নলকূপের জল অপেক্ষাকৃত জীবানুমুক্ত। এই জলকে কোনও রকম শোধন না করেই ব্যবহার করা যায়। ষাটের দশকের শেষের দিকে বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান) শিশুমৃত্যুর হার অত্যন্ত বেড়ে যায়। এর প্রধান কারণ ছিল জলবাহিত রোগ। সেই সময়ে আন্ত্রিক রোগ কয়েকবার মহামারীর রূপ ধারণ করে। এর পরবর্তী কালে

অর্থাৎ সত্তরের দশকের থেকেই ভারত, বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বহু দেশেই নলকূপ স্থাপনের কাজ শুরু হয়ে যায়। এর ফলে প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষই নলকূপের আওতায় চলে আসে।

এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে সত্তরের দশককে আমরা ভূগর্ভের জলের দশক হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। এই দশকেই ভূগর্ভের জলের প্রতি মানুষের আগ্রহ সবচেয়ে বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই দশকেই বিজ্ঞান সম্মত ভাবে ভূগর্ভের জলের তথ্য অনুসন্ধানকে প্রধান গুরুত্ব দিয়ে প্রায় সব দেশেই এবং আমাদের সব রাজ্যেই জল অনুসন্ধান দপ্তর স্থাপিত হয় ও ভূগর্ভের জলের স্তরের ওঠানামা নিয়মিত নথিবদ্ধ করে রাখার প্রথা সরকারিভাবে চালু হয়। এর সাথে কৃষিপ্রধান এলাকাগুলিতে এবং প্রধানত: ধান চাষের এলাকাতে গভীর ও অগভীর নলকূপ স্থাপন করে বছরে একাধিকবার সেচের মাধ্যমে চাষকরার প্রথা শুরু হয়।

আশির দশকের শুরুতে আর এক ধরণের চাষ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। তা হল বোরো ধান চাষ। এই ধান শীত কালে বপন করা হয়ে থাকে এবং বসন্তের শেষে এর ফসল ওঠে। এই ধান, বিশেষত: হাই ইল্ডিং জাতের হওয়ার দরুণ প্রচুর ফলন হয় ও এর দামও ভালো পাওয়া যায়। এর প্রতি চাষীর আগ্রহ বাড়ায় ওই এক দশকেই বোরো ধান চাষের এলাকা এক লাফে কয়েক গুণ বেড়ে গেল। কিন্তু এই চাষ সবটাই সেচের জলের ওপর নির্ভরশীল। অথচ সেই সময়ে নদী নালার জলে টান পড়ে। তাই এর জলের যোগান দিতে লাগল হাজার হাজার গভীর ও অগভীর নলকূপ।

অচিরেই তার আঘাত এসে পড়ল প্রকৃতির ভারসাম্যের ওপর। যে পরিমাণ বৃষ্টির জল ভূগর্ভে প্রবেশ করতে পারে তার থেকে বেশী পরিমাণ জল তুলে নেওয়া হতে লাগল। অতিরিক্ত জল উত্তোলনের ফলে কোথাও কোথাও ভূগর্ভের জলের স্তর নেমে যেতে লাগল। এর ফলে জল উত্তোলনের সমস্যা দেখা দিল। তার সমাধান করতে প্রযুক্তিগত কিছু অগ্রগতিও ঘটল। বিভিন্ন ধরণের পাম্পের উদ্ভাবন ঘটল। তার দরুন এক দিকে জল তোলার সমস্যার সমাধান হল। অন্য দিকে এক বিশাল সমস্যার অতল গর্ভে আমরা নিমজ্জিত হলাম। যে ভূগর্ভের জলকে আমরা জীবাণু মুক্ত বলে নিশ্চিন্তে পান করছিলাম সেই জলই বিষ হয়ে আমাদের এমন এক সংকটে ফেলে দিল যে আজ সারা বিশ্বের মানুষ হতচকিত হয়ে এর প্রতিকারের রাস্তা খুঁজতে হন্যে হয়ে ফিরছে। এই বিষের নাম আর্সেনিক।

প্রকৃতপক্ষে এই আর্সেনিক কি? কেনই বা আজ জলের মধ্যে এসে দেখা দিল? এর থেকে প্রতিকারের রাস্তাই বা কি এই প্রশ্ন আজ প্রতিটি মানুষেরই মনে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ আজ এই আর্সেনিকের প্রভাবে মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত। বহু লক্ষ মানুষ আজ এর শিকার। সারা পৃথিবীর জলবিজ্ঞানীরা ও ভূতাত্বিকেরা এর সমাধান খুঁজতে কাজে নেমে পড়েছেন।

আর্সেনিকের ইতিহাস

আর্সেনিক আমাদের পানীয় জলে আবির্ভূত হওয়ার বহু আগেই এর নাম ও ক্রিয়াকলাপ মাণুষের জানা ছিল। ভালো এবং খারাপ এই দুরকম কাজেই প্রায় কয়েক হাজার বছর ধরে এর ব্যবহার চলে আসছে। আমাদের ইতিহাস, সাহিত্য, বাণিজ্য এই সব ক্ষেত্রেই বহুযুগ আগে থেকে আর্সেনিক স্বমহিমায় উপস্থিত। আর্সেনিক নামটা নিয়েই ভাবা যাক প্রথমে। এই নাম এসেছে আর্সেনাল বা মারনাস্ত্র থেকে। অর্থাৎ আর্সেনিক বহুকাল ধরেই একটি প্রতিষ্ঠিত মারনাস্ত্র। যুগে যুগে বহু অপরাধ, বহু হত্যা সংঘটিত করার কাজে আর্সেনিকের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। ঝানু অপরাধীদের কাছে আর্সেনিক বিষের রাজা হিসাবে স্বীকৃত।

আর্সেনিক বিষ হিসাবে পরিচিত হওয়ার বহু যুগ আগে আর্সেনিকের বিভিন্ন প্রাকৃতিক যৌগ মানুষের কাজে লেগেছিল। একেবারে প্রথমে একে পাওয়া গিয়েছিল টিনের মত দেখতে ভঙ্গুর খনিজ পদার্থ রূপে। সম্ভবতঃ একে মেসোপটেমিয়ায় বলা হত ইম-সিম-তক-সহর-আসগেগে। যদিও এর আসল পরিচয় অর্থাৎ এটা যে আর্সেনিকের একটি যৌগ তা জানা ছিল না। প্রাচীন আরব এ্যালকেমির পুঁথিতে রিয়ালগার (AsS) নামক আর্সেনিকের খনিজ যৌগটির কথা বলা আছে। এ্যারিস্টটল আর একটি আর্সেনিক সালফাইডের সন্ধান পান এবং তার নাম দেন স্যান্ডারাক। প্রথম শতাব্দিতে এই স্যান্ডারাকের সাথে আর্সেনিকের নাম যুক্ত হয়ে নাম বদল হয়ে হয় আর্সেনিকাম। আর্সেনিকাম আসলে অর্পিমেন্ট নামক খনিজ পদার্থ। এই খনিজ পদার্থটির অর্পিমেন্ট নাম দেয় গ্রীকেরা। তাদের ধারণা ছিল সোনালী রঙের এই খনিজটির মধ্যে সোনা আছে। রূপ দেখে প্রথমে এর নাম হয় অরোপিগমেন্টাম বা স্বর্ণরেনু। প্লিনি লিখেছেন রাজা ক্যালিগুলা অর্পিমেন্ট থেকে সোনা তৈরী করেছিলেন। কিন্তু তখন অর্পিমেন্টের দাম চার দিনার প্রতি পাউন্ড থাকা সত্বেও এই সোনা তৈরী লাভজনক হয়নি। প্লিনি আরও লিখেছেন যে অর্পিমেন্ট সোনার মত দেখতে হলেও এ ছিল বড়ই ভঙ্গুর। সহজেই গুঁড়ো করা যেত বলে চিত্রকরদের কাছে রঙের উপাদান হিসাবে খুবই প্রিয় ছিল। ২৬০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক রাজা ডায়াক্লিটিয়ান হঠাৎ সমস্ত এ্যালকেমিস্টদের ওপর প্রচন্ড চটে গেলেন কারণ তাঁরা অর্পিমেন্ট থেকে সোনা তৈরী করতে ব্যর্থ। তিনি তাই রাগ করে মিশরের যে সব পুঁথিতে সোনা তৈরীর কথা লেখা ছিল সব ধ্বংস করে দেন।

গ্রীক পুরাণে আমরা দেখতে পাই অলিম্পাস পর্বতে দেবতাদের অস্ত্রের কারিগর হেফিস্টাস বিকলাঙ্গ ছিলেন। সে যুগে ব্রোঞ্জের সাথে সংকর হিসাবে আর্সেনিক মেশানো থাকত। অস্ত্র তৈরীর সময়ে ক্রমাগত আর্সেনিকের সংস্পর্শে আসার দরুণ সম্ভবতঃ হেফিস্টস বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। কর্মক্ষেত্রজাত অসুস্থতার এটই বোধহয় প্রথম উদাহরণ।

আর্সেনিক যৌগ এবং ধাতব আর্সেনিক বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ ব্যবহার করে আসছে। রিয়ালগার এবং অর্পিমেন্ট এদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল। প্রসাধন হিসাবে সুন্দরীরা এর গূঁড়ো ব্যবহার করত। অর্পিমেন্ট ছিল চিত্রকরদের প্রিয় এর সোনালী বর্ণের জন্য। চিত্রকর সেনিনি লিখেছেন ‘অর্পিমেন্টের বর্ণ হলুদ, কিন্তু এটা নি:সন্দেহভাবে বিষাক্ত। তবে রং

হিসাবে এ সোনার সবচেয়ে কাছাকাছি। দেয়ালের ফ্রেস্কো এবং টেম্পারার কাজে একে ব্যবহার করা যায়না, কারণ কিছুদিন পরেই তা কালো হয়ে যায়।'

টুটেন খামেনের সমাধিতে একটা কাপড়ের থলিতে অর্পিমেন্ট পাওয়া গিয়েছিল। বোঝা যায় মিশরেও অর্পিমেন্টের কদর ভালই ছিল। এই অর্পিমেন্ট আমদানি হত পারস্য, আর্মেনিয়া ও এসিয়া মাইনর থেকে। মিশরীয়রা টিন ও তামার সাথে মিশিয়ে আর্সেনিক ব্রোঞ্জ তৈরী করত। আয়না তৈরীর জন্যও আর্সেনিক ব্যবহৃত হত।

ওষুধ হিসাবে আর্সেনিকের ব্যবহার প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে। প্লিনি লিখেছেন, 'রিয়ালগার সোনা ও তামার খনিতে পাওয়া যায়। ক্ষত পরিষ্কার ও রক্ত বন্ধ করার কাজ এই বস্তুটি করতে পারে। তা ছাড়া এটি ঘা পাঁচড়ার ওষুধ। তার্পিনের সাথে মিশিয়ে খেলে কন্ঠস্বর সুরেলা করে ও হাঁপানি দূর করে। অর্পিমেন্ট নাকের ডগার আঁচিল ও বিভিন্ন স্থানের মাংসস্ফিতির ওষুধ।'

ভারতবর্ষে গৌতমবুদ্ধের কাল থেকেই আর্সেনিক প্রচলিত ছিল। অর্পিমেন্টের ভারতীয় নাম চরক সংহিতায় দেওয়া হয়েছে হরিতাল। রিয়ালগারকে বলা হয়েছে মন:শিলা। আর্সেনিক ধাতুটির ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নাম। সংস্কৃততে একে শংখ, হিন্দিতে সংখিয়া এবং বাংলায় সেঁকো বিষ বলা হয়। ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে বলা হয়েছে উপযুক্তভাবে শোধন করা হরিতাল (অর্পিমেন্ট) শ্লেষ্মা, বিষ এবং ভুতের ভয় দূর করে, শরীরের তাপ ও ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া এটা কুষ্ঠ রোগের ওষুধ। অশোধিত হরিতাল সেবন করলে অকালমৃত্যু ঘটতে পারে। অন্যদিকে মন:শিলা (রিয়ালগার) হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস এবং মেদবৃদ্ধির ওষুধ। অশোধিত মন:শিলার বিষক্রিয়ায় পাথুরী ও ক্ষুধাহীনতা ঘটে।'

ষোড়শ শতকে প্যারাসেলসাস নামে একজন পন্ডিত জেনেক্সটন প্যারাসেলসি নামক ওষুধ প্রস্তুত প্রণালীতে বলেছে, 'রোদে শুকোনো ১৮ টি কোলা ব্যাংয়ের গুঁড়ো, সাদা এবং লাল আর্সেনিক, মুক্তো, প্রবাল, নানা ধরণের দামী পাথর ও গাছ গাছড়া মিশিয়ে পেস্ট তৈরী করে গলায় মাখালে প্লেগ হওয়ার ভয় থাকে না।'

বিষ হিসাবেও আর্সেনিক বহু প্রাচীনত্বের দাবি করতে পারে। ৩৪০ খৃষ্টপূর্বাব্দে এরিস্টটল একে গবাদি পশু নিধনকারী বিষ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের চীনা এনসাইক্লোপিডিয়া অব মেডিসিনে আর্সেনিককে ইঁদুর ও পোকা মারার বিষ হিসাবে লিপিবদ্ধ করা আছে। উনবিংশ শতক পর্যন্ত আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড ছিল পেশাদার খুনিদের সবচেয়ে প্রিয় বিষ। মেডিকাল জুরিস্প্রুডেন্সে আর্সেনিকের বিষক্রিয়াকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আমরা যদি ইতিহাসের পাতায় তাকাই সেখানে দেখতে পাব আর্সেনিকের সাহায্য নিয়ে শত শত রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটিত হয়েছে। এর এক মস্ত বড় প্রমাণ সেন্ট হেলেনায় নেপোলিয়ানের মৃত্যু। শোনা যায় তাঁর ঘরের দেয়ালের রঙে আর্সেনিক ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রাচীন ইংল্যান্ডে আর্সেনিক মেশানো মোমবাতি পাওয়া যেত যা জ্বালালে আর্সিন নামক এক মারাত্বক গ্যাস উৎপন্ন হয়। কাউকে খুব ধীর বিষক্রিয়ায় হত্যা করার জন্য তার ঘরে এই মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখা হত।

আমরা সাহিত্যেও আর্সেনিকের উপস্থিতি বহুবার পেয়েছি। শার্লক হোমসের গল্পে, এমনকি আমাদের দেশী বাংলা গল্পেও আর্সেনিক বিষ হিসাবে জায়গা করে নিয়েছে। বিভুতিভুষণের চাঁদের পাহাড়, সৈয়দ মুজতবা আলির দুহারা উপন্যাসে, বনফুলের গল্পে আর্সেনিক এসেছে বিষ হিসাবে।

আজ বাংলার এক বিরাট অংশ এই আর্সেনিকের বিষে আক্রান্ত। কোন পেশাদার খুনি এই আর্সেনিক আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করেনি। এই বিষ যার বুকে জন্মে আমাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে সে আমাদেরই এই ধরিত্রী মা, যাকে অবহেলা করে, যাকে না বুঝে, অতিশোষণ করে তার গর্ভের বিষের ভান্ড আমরা উন্মুক্ত করে দিয়েছি।

আর্সেনিকের রসায়ন

মৌলিক পদার্থ হিসাবে আর্সেনিক চিহ্নিত হয় ১২০০ সালে। জার্মান ডোমিনিকান এলকেমিস্ট এলবার্টাস ম্যাগনাসকে ধাতব আর্সেনিকের আবিষ্কারক হিসাবে স্বীকার করা হয়ে থাকে। কিন্তু রিয়ালগার এবং অরপিমেন্ট যে একটি ধাতব পদার্থের যৌগ সেই ধারণার জন্ম কিন্তু দিয়েছিলেন জোসিমাস নামে একজন এলকেমিস্ট চতুর্থ শতকে। ১৬৪১ সালে স্রোডার নামক জনৈক কেমিস্ট তাঁর ফার্মাকোপিয়াতে লেখেন, কাঠকয়লার সাথে পোড়ালে আর্সেনিক অক্সাইড থেকে আর্সেনিক পাওয়া যায়। ১৭৩৩ সালে ব্র্যান্ড নামে আর একজন কেমিস্ট প্রথম সঠিক পরীক্ষার সাহায্যে আর্সেনিকের রাসায়নিক ধর্ম প্রমাণ করেন। এর পর থেকেই কৃত্রিম ভাবে আর্সেনিকের নানা যৌগ প্রস্তুত করা শুরু হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে আর্সেনিকের অসংখ্য যৌগিক পদার্থের আবিষ্কারের সাথে সাথে এর ব্যবহারের নানা দিক উন্মুক্ত হয় এবং ক্রমেই আর্সেনিকের বহুমুখি রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে মানুষ জানতে পারে।

মৌলিক পদার্থ আর্সেনিক একটি ইস্পাত-ধুসর বর্ণের কেলাসিত বস্তু। এর আণবিক সংখ্যা ৩৩ , আণবিক ভর ৭৪.৯২ এবং ঘনত্ব ৫.৭২৭। এর গলনাংক ৮৩৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। রাসায়নিক চরিত্রে ফসফরাসের সাথে এর যথেষ্ট মিল আছে। আর্সেনিকের রাসায়নিক ধর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ আর্সেনিকের বিষক্রিয়া তার যোজ্যতা, জৈব এবং অজৈব রূপটির ওপর নির্ভর করে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে এর গুণাগুণ কি ভাবে বিকশিত হয় সেটাও অনুধাবন করার বিষয়।

আর্সেনিকের যোজ্যতা চারটি:- (-৩), ০, ৩, এবং ৫। (-৩) যোজ্যতার অবস্থায় আর্সেনিক আর্সিন ও মিথাইলআর্সিন যৌগ গঠন করে। তবে এই যৌগগুলি ক্ষণস্থায়ী বা অস্থায়ী। মৌলিক আর্সেনিক পাওয়া যায় আর্সেনিক অক্সাইডের বিজারণের দ্বারা। আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড আর্সেনিকের তিন যোজ্যতার দরুণ সৃষ্টি হয়। পাঁচ যোজ্যতার অক্সাইডের নাম আর্সেনিক পেন্টক্সাইড।

প্রকৃতিতে মৌল হিসাবে আর্সেনিক প্রায় অনুপস্থিত। সাধারণত: সালফাইড আকর, আর্সেনাইড ও আর্সেনেট রূপে এ প্রকৃতিতে বিরাজ করে। আর্সেনিকের যৌগগুলো বিশ্লেষিত হয় অর্সেনেট তৈরী করে। আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড জারিত হয়ে যে দুটি প্রধান যৌগ গঠন করে

তাদের নাম হল আর্সেনিক পেন্টক্সাইড ও অর্থোআর্সেনিক এসিড। এই জারণের ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসাবে ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতি প্রয়োজন।

ভেজা মাটিতে আর্সেনিকের বিভিন্ন যৌগ নানাধরণের রাসায়নিক ও জৈবরাসায়নিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। যদি অক্সিডেশন-রিডাকশন পোটেনশিয়াল বা Eh খুব বেশী থাকে তবে পাঁচ যোজ্যতার আর্সেনিক H_2AsO_4, $HAsO_2$ এবংAsO_4^{3-} ইত্যাদি অম্ল এবং আয়ণ রূপে অবস্থান করে। কিন্তু কম Eh অবস্থায় তিন যোজ্যতার আর্সেনিক যৌগগুলি যেমন AsS_2 থাকার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। খুব বিজারক পরিবেশে As_3 ই প্রাধান্য পায়।

জলের মধ্যে আর্সেনিকের অজৈব এবং জৈব দুরকমরই যৌগ জন্মায়। এ ক্ষেত্রে Eh, pH জৈব বস্তুর পরিমাণ, দ্রবিভূত অক্সিজেন, ইত্যাদি আর্সেনিকের রাসায়নিক ব্যবহার ও পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে। জলে মুক্ত আর্সেনিক আয়ন হিসাবেই প্রধানতঃ থাকে এবং মৌল হিসাবে থাকেনা বললেই চলে। খুব কম Eh পরিবেশে কখনও কখনও As^3 পাওয়া যায়। সাধারণতঃ জলে আর্সেনিকের যে সব যৌগ থাকে তা হল আর্সেনেট, আর্সেনাইট, মিথেনিআর্সেনিক এসিড এবং ডাইমিথাইলআর্সেনিক এসিড। জলে যদি জৈব বস্তুর পরিমাণ কম থাকে, দ্রবিভূত অক্সিজেন, Eh, pH বেশী থাকে তবে পেন্টাভ্যালেন্ট আর্সেনিক [As(V)] যৌগগুলি তৈরী হয়। ঠিক এর বিপরীত পরিবেশে আর্সেনিকের সালফাইড ও আর্সেনাইট তৈরী হয়। জলের তাপমাত্রাও আর্সেনিকের বিভিন্ন যৌগের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেখা গেছে গ্রীষ্মকালে জৈব যৌগের পরিমাণ বেড়ে যায় ও শীতকালে তা কমে যায়। এর কারণ সম্ভবতঃ গ্রীষ্মকালেই ব্যাকটিরিয়াদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়।

জলের রাসায়নিক পরিবেশ ছাড়াও ভৌত পরিবেশও আর্সেনিকের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। জলে জৈব কলয়েড বেড়ে গেলে এবং অদ্রবীভূত খনিজ পদার্থের পরিমাণ কমে গেলে আর্সেনেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়াও হাইড্রাস আয়রণ অক্সাইডের সাথে আর্সেনেট অধঃক্ষেপিত অথবা সংযুক্ত (adsorbed) হয়। জল থেকে দ্রবীভূত আর্সেনিককে আলাদা করতে এই হাইড্রাস আয়রণ অক্সাইডের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

হ্রদের মাইক্রোর্গানিজম বা অনুজীবগুলো জলে As III কে As V এ রূপান্তর অথবা বিপরীত পরিবেশে As V কে As III তে রূপান্তরিতকরে যা Eh/pH এর ওপর নির্ভরশীল। ফাঙ্গাস, ব্যাকটিরিয়া এবং ইস্ট অজৈব আর্সেনিকের যৌগকে জৈব যৌগে রূপান্তরিত করে।

আর্সেনিক ও বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে যে ধরণের বিক্রিয়া ঘটে তার কিছু উদাহরণ দিলে আর্সেনিকের রাসায়নিক ধর্ম আরও পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে। ল্যাবরেটারীতে কৃত্রিম ভাবে নানা ধরণের পরিবেশ সৃষ্টি করে অনেক ধরণের যৌগ গঠন করা যায়। কিন্তু প্রকৃতিতে রাসায়নিক পরিবেশের একটা মাত্রা বা সীমা আছে। কাজেই প্রাকৃতিক পরিবেশে আর্সেনিকের ব্যবহার বিভিন্ন ধাতুর সাথে কিরকম তা জানা প্রয়োজন

মৃত্তিকায় আর্সেনিক সঞ্চয়ের একটি মূল উপাদান হাইড্রাস আয়রন অক্সাইড। এই বস্তুটির সাথে জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন আর্সেনিক যৌগ (Al_2AsO_4-, $HAsO_4$2- এবং H_3AsO_3) বিক্রিয়া করে স্করোডাইট (Al_2AsO_4, $2H_2O$) নামে একটি মিনারেল তৈরী করে। ম্যাঙ্গানিজ

হাইড্রক্সাইড অম্ল পরিবেশে আর্সেনিকের যৌগের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ম্যাঙ্গানিজের আর্সেনেট তৈরী করে। এলুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইডও ক্ষারকীয় পরিবেশে আর্সেনিকের সাথে যৌগ গঠন করে। দ্রবীভূত আর্সেনিককে অধ:ক্ষেপিত করার ক্ষেত্রে এর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা আছে।

জারক ও বিজারক পরিবেশে জলে দ্রবীভূত আর্সেনিক যৌগগুলো কি ভাবে অক্সাইড ও সালফাইড তৈরী করে তা কয়েকটি বিক্রিয়ার সাহায্যে বোঝা যায়। জলের Eh যখন কম তখন সালফাইড যৌগ এবং তার অধ:ক্ষেপের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সেই সাথে বৃদ্ধি পায় [As(III)]এর পরিমাণ। বিক্রিয়া গুলি এ রকম:-

১) $H_2AsO_4 + 3H+ +2e- = H_3AsO_3 + H_2O$

২) $2 H_3AsO_3 + 6H++ 3S_2- = As_2S_3+ 6H_2O$

৩) $2As_2S_3+4e- = 4AsS + 2S_2-$

আবার যখন জলের Eh এর মাত্রা বৃদ্ধি পায়, রাসায়নিক পরিবেশ জারক অবস্থায় চলে যায়। সে ক্ষেত্রে অক্সাইডের পরিমাণ এবং [As(V)] এর পরিমাণ বেড়ে যায়। সালফাইড যৌগগুলো জারিত হয়ে আর্সেনেট ও দ্রবীভূত যৌগ গঠন করে।

অজৈব আর্সেনিক আবার নানা ভাবে জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়। যেমন আর্সেনিক এসিডের হাইড্রক্সিল গ্রুপ CH_3 দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে মনোমিথাইল আর্সেনিক এসিড, ডাইমিথাইল আর্সেনিক এসিড এবং ট্রাইমিথাইল আর্সিন অক্সাইড তৈরী হয়। এই পরিবর্তন জীবিত প্রাণীদের দ্বারা জলে সংঘটিত হয়। সাধারণ অনুজীব এবং এলগী ও ফাঙ্গাস নানা জাতীয় কীট ও শামুক জাতীয় প্রাণীর খাদ্য। এই সব ছোট প্রাণী ও শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ খেয়ে আরও বড় প্রাণী যেমন মাছ ও অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীরা বেঁচে থাকে। অজৈব আর্সেনিক প্রথমে অনুজীবের দেহে প্রবেশ করে তারপর খাদ্যশৃঙ্খল বেয়ে মেরুদন্ডী প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করে। মানুষ খাদ্যশৃঙ্খলের সবচেয়ে ওপরে বাস করে। আর্সেনিক মানুষের শরীরে প্রবেশ করে সাধারণত: মাছ ও চিংড়ি জাতীয় প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করার ফলে। উপরে লেখা তিনটি আর্সেনিকের জৈব রাসায়নিক যৌগই সবচেয়ে সরল, যা অনুজীবগুলির দ্বারা অনুঘটিত হয়।

আর্সেনিকের জৈব যৌগগুলি অজৈব যৌগগুলির থেকে কম বিষাক্ত। জৈব যৌগ প্রচুর পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করলে তবেই এর বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। অজৈব আর্সেনিকের মধ্যে তিন যোজ্যতার আর্সেনিক পাঁচ যোজ্যতার আর্সেনিকের থেকে ষাট গুন বেশী বিষাক্ত.।

আর্সেনিকের রাসায়নিক ধর্ম ও বিভিন্ন পরিবেশে তার রাসায়নিক ব্যবহার এবং যৌগ গঠনের ক্ষমতা বিভিন্ন এবং বিচিত্র। বহু প্রাচীন ভূতাত্বিক কাল থেকে কোটি কোটি বছর ধরে আর্সেনিক পৃথিবীতে আছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে এর বিস্তার ঘটেছে। প্রস্তরের স্তর থেকে জলে, জল থেকে মাটিতে জৈবমন্ডলে অথবা বায়ুমন্ডলে এর সঞ্চার হয়েছে। বিভিন্ন ভূতাত্বিক পরিবেশে আর্সেনিক অসংখ্য খনিজ পদার্থ গঠন করেছে। তাই এর ভূতাত্বিক ইতিহাসও কম চাঞ্চল্যকর নয়।

আর্সেনিকের ভূতত্ত্ব

যে কোনও প্রাকৃতিক বস্তু তা সে জীব বা জড় পদার্থ যাই হোকনা কেন, কোনও একটি স্থানে কোনও একটি বিশেষ সময়ে তার অবস্থান মূলতঃ নির্ভর করে তার ভূতাত্বিক পরিবেশের ওপর। কোনও একটি পাথর বা কোনও খনিজ পদার্থ যখন সৃষ্ট হয় তখন সেই সৃষ্টির পেছনে ক্রিয়া করে নানা ভূতাত্বিক পদ্ধতি। বৃষ্টি, নদী, হিমবাহ, আগ্নেয় উৎপাত, পর্বতের উত্থান, ভূমিক্ষয়, সাগরের আগ্রাসন বা অপসারণ ইত্যাদি নানা ভূতাত্বিক ঘটনা অহরহ পৃথিবীতে ঘটে চলেছে। কখনও বা আগ্নেয়গিরির লাভাপ্রবাহ উত্থিত হয়ে পর্বত সৃষ্টি করছে। সেই পর্বত ক্ষয় হয়ে পলিমাটির রূপে সমুদ্র বা নদীর তলদেশে জমা হছে। কালে দিনে সেই পলি শিলীভূত হয়ে পলল শিলা গঠন করেছে। আবার কোথাও সেই সমুদ্রের তলদেশের শিলাস্তর ঠেলে উঠে বলিত পর্বতের জন্ম দিয়েছে। এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে মূল শিলা বা মিনারেলের ভৌতিক ও রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছে। এই ঘটনাগুলিই আর্সেনিকের চলন, সঞ্চয় এবং এক খনিজ পদার্থ থেকে অন্য খনিজ পদার্থ বা এক যৌগ থেকে অন্য যৌগে রূপান্তরকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

আর্সেনিক বিশ্বের সহজলভ্য প্রথম কুড়িটি মৌলিক পদার্থের অন্যতম। কাজেই জল স্থল এবং বায়ুমন্ডল, সর্বত্রই একে পাওয়া যায়, কোথাও কম বা কোথাও বেশী পরিমাণে। আর্সেনিকের যে সব খনিজ পদার্থ সবচেয়ে বেশী পরিচিত তা হল রিয়ালগার, অর্পিমেন্ট, আর্সেনোপাইরাইট, কোবালটাইট, ইত্যাদি। এই সব খনিজ গুলি হল সালফাইড, অক্সাইড এবং আর্সেনিক লবন। বিভিন্ন ভূতাত্বিক সময়ে নানা রূপান্তরের মাধ্যমে এবং ভূতাত্বিক পরিবেশের প্রভাবে নানা ক্ষেত্রে নানা আর্সেনিক খনিজের সমাহার ঘটেছে।

আর্সেনিকের ভূরসায়নতত্ত্ব সম্পর্কে যতদূর জানা যায় হাইড্রোথার্মাল সলিউশন বা আগ্নেয়গিরির আগ্নেয়প্রবাহের শেষ পর্যায়ে তপ্ত জলধারার মধ্যেই আর্সেনিক গভীর ভূগর্ভ থেকে উঠে এসে ভূত্বকে তার প্রাথমিক আশ্রয় লাভ করে। এই প্রাথমিক আর্সেনিক যৌগ পরবর্তী সময়ে আগ্নেয় উৎপাত, রূপান্তরিত শিলীভবন, ক্ষয় ও আবহবিকারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নানা ধরণের খনিজ পদার্থ গঠন করে। বিভিন্ন রাসায়নিক এবং ভূতত্ত্ববিদের মতে প্রথমে অতি তপ্ত জলের সাথে আর্সেনিকের হাইড্রক্সাইড যৌগ গঠিত হয়। গন্ধকের প্রতি তার অতিরিক্ত আকর্ষণ থাকার জন্য উপযুক্ত পরিবেশে অচিরেই সে আর্সেনিক সালফাইড তৈরি করে। প্রথম ক্ষেত্রে গঠিত হয় অর্পিমেন্ট; এর পরে HCO_3- আয়নের প্রভাবে অর্পিমেন্ট ক্রমশঃ লীচড হতে থাকে এবং অর্পিমেন্টের কিছুটা রিয়ালগারে পরিবর্তিত হয় ও ভূস্তরে সঞ্চিত হতে থাকে। এর পরে আরও জটিল ভূতাত্বিক পরিবেশে আর্সেনিকের সালফোসল্টস তৈরী হয়। এই সালফোসল্টস হল সেই সব যৌগ যার মধ্যে কোনও ধাতু যথা লোহা,সীসা, তামা, দস্তা ইত্যাদি এবং আর্সেনিক ও সালফার থাকবে। এই ভাবে একটার পর একটা আর্সেনিক ও নানা ধাতুর আর্সেনাইড যৌগ গঠিত হয়। এই পর্যায়ে যেসব গ্রুপের খনিজ পদার্থ তৈরী হয় তা হলঃ-

১) পাইরাইট গ্রুপ : $NiAsS$, $CoAsS$, $PbAs_2$, $PdAs_2$

২) মার্কাসাইট গ্রুপ: $NiAs_2$

৩) আর্সেনোপাইরাইট গ্রুপঃ $FeAsS$,$CoAs_2$

৪) নিকেল আর্সেনাইড গ্রুপ: NiAs, CoAs ইত্যাদি

আর্সেনোপাইরাইট এবং পাইরাইটকে বলা হয় সহোদয় জুটি (paragenetic)। একটির অবস্থানের সাথে আর একটি থাকবেই। আর্সেনিকের ভূরাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি খুবই জটিল কিন্তু এই বিক্রিয়াগুলি সবসময় চলছে ভূতাত্ত্বিক পরিবেশের সাথে তাল মিলিয়ে।

আর্সেনিক রাসায়নিক চরিত্রে ফসফরাসের মত। ফসফরাস গাছপালার একটি প্রধান পুষ্টি উপাদান। কাজেই মাটিতে আর্সেনিকের উপস্থিতিতে গাছ ফসফরাসের বদলে বিষাক্ত আর্সেনিককে গ্রহণ করে থাকে। আর্সেনিকের জল থেকে মাটিতে বা মাটি থেকে জলে চলন নির্ভব করে Eh /pH এর ওপর, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ এর অক্সাইড, হাইড্রক্সাইড ইত্যাদির ওপর। লোহা, ম্যাঙ্গানিজ ও এলুমিনিয়ামের হাইড্রাস অক্সাইড এবং অক্সাইডগুলি জারক পরিবেশে আর্সেনিককে ধরে রাখে নিজেদের সাথে। সালফাইটের উপস্থিতিতে এবং কম অক্সিজেনের প্রাপ্তিতে আয়রণসালফাইডের সাথে আর্সেনিক আর্সেনোপাইরাইট (FeAsS) এবং রিয়ালগার (AsS)ও অরপিমেন্ট($As2S_3$) রূপে অধ:ক্ষেপিত হয়। [As(IV)] লোহার সাথে বেশী যুক্ত হয় বলে [As(III)] জলে বেশী চলনশীল। [As(IV)] লোহার হাইড্রাস অক্সাইডের সাথে অব:ক্ষেপিত হয়ে স্করডইট বলে একটি খনিজ যৌগ গঠন করে। তার সমীকরণটি নিম্নরূপ:

$Fe(OH)_3 + HAsO_4 = FeAsO_4, 2H_2O + H_2O$

জলীয় পরিবেশে আর্সেনিক আরও নানা ধরণের অর্গানোআর্সেনিকাল জৈব যৌগ গঠন করে। এই জৈব যৌগগুলির রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অনুজীবের ভুমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আরও একটি প্রণিধানযোগ্য তথ্য হল বিজারিত আর্সেনিক কেবলমাত্র অক্সিজেনবিহীন জলেই পাওয়া যায়। যে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ বেশী সেখানে পাওয়া যায়না।

পরিবেশে আর্সেনিক

পৃথিবীতে প্রায় সবরকম পরিবেশেই আর্সেনিক পাওয়া যায়। এটা ভাবলে ভুল হবে যে আর্সেনিক কেবল মাত্র পাথরে মাটিতে বা জলে পাওয়া যায়। বায়ুমন্ডলে এবং জৈব বস্তুতেও আর্সেনিক স্বমহিমায় উপস্থিত। নীচে একটা সারণীতে দেখানো হল কোন ধরণের পরিবেশে কি পরিমাণ আর্সেনিক পাওয়া যায়।

সারণী ১: বিভিন্ন পরিবেশে অর্সেনিকের পরিমাণের আনুপাতিক হার

পরিবেশ	মৃত্তিকার তুলনায় আনুপাতিক পরিমাণ
প্রস্তর স্তর	২৫,০০০
সমুদ্র	৪
মৃত্তিকা	১
জীব মন্ডল (গাছ, পশু, মানুষ, অনুজীব)	০.০০০৫
বায়ুমন্ডল	০.০০০০০১

প্রস্তর স্তরে আর্সেনিকের পরিমাণ নির্ভর করে সেই স্তরটি কোন ধরণের পাথর দিয়ে গঠিত তার ওপর। আগ্নেয় এবং রূপান্তরিতশিলার তুলনায় পাললিক শিলাস্তরে অধিক আর্সেনিক জমা হয়। শিলাস্তরের পরেই মৃত্তিকা এবং সমুদ্র সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আর্সেনিক বহন করে। এর পরে আছে জীবচক্র এবং বায়ুমন্ডল।

আর্সেনিক কোনও একটা পরিবেশে স্থির হয়ে থাকেনা। পৃথিবীর মধ্যে ভূপ্রাকৃতিক যে পরিবর্তনগুলি চলে তার সথে সামঞ্জস্য রেখে আর্সেনিক এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে গিয়ে জমা হয়। এই পরিবেশ পরিবর্তনের হার নীচের সারণীতে দেওয়া হল।

সারণী ২: আর্সেনিকের চলনের হার

যেখান থেকে যায়	যেখানে যায়	পরিমাণ (X১০^{৮} গ্রাম প্রতি বছর)
ভূমি	সমুদ্র	৩০০০
	বায়ুমন্ডলে	১০০০
	জীবমন্ডলে	৩০০
বায়ুমন্ডল	সমুদ্র	২০০০
	ভূমি	১০০০
সমুদ্র	পলি ও অবক্ষেপ	২৫০০
	জীবমন্ডল	১৩০০
পলি ও অবক্ষেপ	ভূমি	২৪০০

মানুষের ভূমিকা

আর্সেনিকের সঞ্চালনে মানুষেরও একটি ভুমিকা আছে। পাথরের স্তর থেকে মৃত্তিকায় আর্সেনিক যাওয়ার জন্য মানুষ যে যে কারণে দায়ী তা হল কলকারখানা বা শিল্প, কৃষি, বনসৃজন এবং কয়লাজাত বস্তু প্রস্তুতি ও কয়লার দহন।

কারখানার থেকে আর্সেনিক দূষণ

সীসা, দস্তা, তামা, সোনা ইত্যাদির খনিতে আকরের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় আর্সেনিক পাওয়া যায়। এই সব ধাতু নিষ্কাশনের সময় যে বর্জ্য তৈরী হয় তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক জমা হয়।

কীটনাশক

১৮০০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত সীসা, তামা ও দস্তার আর্সেনেট, দস্তার আর্সেনাইট এবং প্যারিস গ্রীন নামক কীটনাশক বাগিচাগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করা হত। সোডিয়াম আর্সেনেট আগাছানাশক হিসাবে ব্যবহৃত হত। আর্সেনিক জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রন করার জন্য পরিবেশ সুরক্ষা এজেন্সি বা EPA দীর্ঘকাল ধরে কীটনাশক হিসাবে আর্সেনিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রন করার চেষ্টা করে আসছে। দেখা গেছে কীটনাশক আর্সেনিক খাদ্যশৃঙ্খলে ঢুকে পড়ে সমস্যার সৃষ্টি করছে। ইপিএ আর্সেনিকাল ডাইসোডিয়াম মিথেনার্সেনিক এসিড, মনোসোডিয়াম মিথেনিআর্সোনেট, আর্সেনিক এসিড ও ক্যাকোডিলিক এসিড বন্ধ করার আদেশ দিয়েছে। ১৯৯৫ সাল থেকেই ক্ষেতে আর্সেনিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

কয়লা ব্যবহার

যে সব কারখানায় কয়লা জাত জ্বালানী পুড়িয়ে শক্তি উৎপন্ন করা হয় সে সব কারখানায় প্রচুর পরিমাণে ফ্লাই এ্যাশ জমা হয়। এই ফ্লাই এ্যাশের মধ্যে আর্সেনিক থাকে বলে জানা গিয়েছে। এই ফ্লাই এ্যাশ যখন জলাধারে গিয়ে জমা হয় তখন সেই জলাধারে আর্সেনিক বেড়ে যায়।

শহরের বর্জ্য পদার্থ

উন্নত শহরের বর্জ্য পদার্থের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। আমেরিকা নেদারল্যান্ড, কানাডা এই সব দেশের নাগরিক বর্জ্যের মধ্যে ৩ থেকে ৪৬ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি হিসাবে আর্সেনিক রয়েছে।

প্রাকৃতিক পরিবেশে আর্সেনিক

ভূতাত্বিক পরিবেশে আর্সেনিক নানা ধরণের খনিজ পদার্থ রূপে অবস্থান করে পাথরের মধ্যে। এটাই তার আদি বাসস্থান হলেও স্থায়ী নয়। পাথর ক্ষয় হয়, তা পলিমাটিতে পরিণত হয়। এই

পলিমাটি আর্সেনিক বহন করে। প্রকৃতিতে মাটির মধ্যে আর্সেনিকের পরিমাণ ৫ থেকে ৬ মিলিগ্রাম প্রতি কিলোগ্রাম। আগ্নেয় ও রূপান্তরিতশিলার তুলনায় পাললিক শিলার মধ্যে অনেক বেশী পরিমাণে আর্সেনিক থাকে। বিজারক পরিবেশে আর্সেনিক মাটির মধ্যে থাকে। যদি মাটিতে অম্লভাব থাকে তবে $H_2AsO_4^{1-}$ এবং মাটি ক্ষারধর্মী হলে $H_2AsO_4^{-2}$গঠিত হয়। মৃত্তিকার মধ্যে আর্সেনিকের বিভিন্ন যৌগ গঠন, পরিবর্তন, জারণ, বিজারণ, উদ্বায়ীভবন এবং বর্ষণ ক্রমাগত ঘটছে। বিজারিত অবস্থায় অজৈব আর্সেনাইট [As(III)] অত্যন্ত বিষাক্ত এবং অত্যন্ত সচল ও দ্রাব্য। আর্সেনেট [As(V)] সে তুলনায় কম বিষাক্ত। এলুমিনিয়াম, লোহা এবং ম্যাঙ্গানিজ আর্সেনিকের সাথে যুক্ত হলে আর্সেনিক জারিত হয়। লোহা এবং ম্যাঙ্গানিজের অক্সাইড আর্সেনিককে আকর্ষণ করে নিজের সাথে যুক্ত করে।

আর্সেনিক যুক্ত মাটির থেকে জলে আর্সেনিক দ্রবীভূত হতে পারে কেবলমাত্র বায়ুহীন ও বিজারক পরিবেশে। এই আর্সেনিকের একটা বড় অংশই হল তিন যোজ্যতার আর্সেনিক [As(III)] । এ ছাড়াও আর্সেনিক জলে মেশা নির্ভর করে সেই মাটির মধ্যে কি ধরণের খনিজ পদার্থ আছে তার ওপর বিশেষ করে লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণের ওপর।

প্রাণী জগৎ ও আর্সেনিক

প্রকৃতিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি এবং আর্সেনিকের দূষণ জৈব পরিবেশের ওপর বিশেষ করে বন্য প্রাণীদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা নীচের ছয়টি বিষয়ে একমত। (১) সমস্ত রকম পরিবেশে এবং সব রকমের জীব কোষেই আর্সেনিক উপস্থিত থাকতে পারে। (২) আর্সেনিকের থেকে জাত ওষুধ ৪০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ থেকে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং দেখা গেছে যে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করলে এর কোনও ক্ষতিকর প্রভাব নেই। (৩) শিল্প এবং কৃষি ক্ষেত্র থেকে একটা বিরাট পরিমাণ আর্সেনিক পরিবেশে চলে যায়, এর ফলে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। (৪) মানুষ এবং প্রাণী খাদ্য, বাতাস এবং জলের মাধ্যমে আর্সেনিক শরীরের মধ্যে গ্রহণ করে। (৫) এর থেকে দীর্ঘস্থায়ী উপসর্গ সৃষ্টি হয়। (৬) বাস্তুতন্ত্রের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব আছে।

মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীদের ওপর আর্সেনিকের প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। পশুদের বৃদ্ধি ও প্রজননের ক্ষেত্রে আর্সেনিকের প্রয়োজন আছে। দেখা গেছে সঠিক মাত্রায় আর্সেনিক .প্রয়োগ করে রেশম কীটের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। গরুর ক্রিমি দূর করতে আর্সেনিক যুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করা ভালো। ০.৩৫ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি পরিমাণে দৈনিক আর্সেনিক যুক্ত খাবার খাইয়ে ছাগল এবং ভেড়াদের স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে ও প্রজনন ক্ষমতা বেড়েছে। কিন্তু পরিবেশে যে কোনও কারণেই হোক মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক থাকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে। সামুদ্রিক প্রাণীরা তাদের দেহ কোষে প্রচুর পরিমাণ আর্সেনিক বহন করে।

পৃথিবীতে এমন বহু জায়গা, সমুদ্র সৈকত, হ্রদ ইত্যাদি আছে যেখানে মানুষের কাজকর্মের জন্য মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক (Anthropogenic) জমা হয়। এই সব অঞ্চলের বন্য প্রাণীদের দেহে তাই আর্সেনিকের পরিমাণও খুব বেশী। বিভিন্ন বন্য প্রাণ ও পরিবেশ সুরক্ষিত

রাখতে এনভায়রণমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সি (ইপিএ) বিভিন্ন প্রাণী ও পরিবেশে আর্সেনিকের যে মাত্রা ঠিক করে দিয়েছেন তার একটি তালিকা নীচের সারণীতে দেওয়া হল:।

সারণী ৩: বিভিন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রে খাদ্য ও পরিবেশে আর্সেনিকের সঠিক মাত্রা

পরিবেশ ও প্রাণী	**আর্সেনিকের নিরাপদ মাত্রা**
জলজ প্রাণ	
মিষ্টি জলের প্রাণী	আর্সেনিকের (AsIII) পরিমাণের চার দিনের গড় ১৯০ মাইক্রোগ্রাম প্রতি লিটার (বৃদ্ধি হ্রাস ও মৃত্যুর পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছে যখন টিসু তে ১.৩ মিলিগ্রাম প্রতি কেজির থেকে বেশী আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে)
লবনাক্ত জলের প্রাণী	আর্সেনিকের (AsIII) পরিমাণের চার দিনের গড় ৩৬ মাইক্রোগ্রাম প্রতি লিটার
পাখী	
হাঁস	৩০ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি ওজনের থেকে বেশী আর্সেনিক প্রয়োগে বৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে
গবাদি পশু	খাবারে প্রতি কেজি তে ৪ থেকে ১০ মিলিগ্রাম
মানুষের খাবার	০.৫ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি শুকনো খাদ্য বস্তুতে।
ফল	As_2o_3 হিসাবে কীটনাশক থেকে জাত আর্সেনিকের ক্ষেত্রে মানুষের সহ্যের ক্ষমতা ৩.৫ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি
পোলট্রিজাত খাদ্য	০.৫ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি শুকনো খাদ্য বস্তুতে
সামুদ্রিক খাবার	৬ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি শুকনো খাদ্য বস্তুতে
পানীয় জল	০.০৫ মিলিগ্রাম প্রতিলিটারে

বাতাস	আর্সিন ৪ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘন মিটার মোট আর্সেনিক ৩ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘন মিটার আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড ০.৩ মাইক্রোগ্রাম প্রতি ঘন মিটার

খাদ্য ও ফসলে আর্সেনিক

পরিবেশের সমস্ত বস্তুতেই আর্সেনিক আছে। স্বাভাবিক ভাবে প্রাকৃতিক কারণে বা মানুষের কার্যকলাপের জন্য তা এক পরিবেশ থেকে অন্য পরিবেশে জমা হয়। কাজেই প্রাণী জগতে বা প্রাণীর দেহে আর্সেনিক উপস্থিত থাকবে তা আর বিচিত্র কি?

খাদ্য শৃঙ্খলে আর্সেনিক কি ভাবে ঢুকে পড়ে কোন পর্যায়ে সঞ্চিত হয় তা নিয়ে কিছু পরীক্ষা হয়েছে। এমনিতে অজৈব আর্সেনিক অনুজীবদের শরীরে প্রবেশ করে সেখান থেকে খাদ্য শৃঙ্খল বেয়ে মানুষ বা অন্যান্য মেরুদন্ডী প্রাণীর দেহ প্রবেশ করে তা নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে আর্সেনিক দূষিতজল দিয়ে সেচ করার ফলে মাটিতে আর্সেনিকের পরিমাণ ও ধান উৎপাদনে তার প্রভাব নিয়ে কিছু পরীক্ষা হয়েছে। এই পরীক্ষায় আর্সেনিক মিশ্রিত জল এবং আর্সেনিক হীন জল দু রকম জলেই পরীক্ষাগারে ধান চাষ করা হয়। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল আর্সেনিক ধান গাছের বৃদ্ধি ও ফলনকে প্রভাবিত করে কিনা এবং তার ফলে গাছের বিভিন্ন অংশে কী পরিমাণ আর্সেনিক সঞ্চিত হচ্ছে তা দেখা। এই পরীক্ষায় ল্যাবরেটারীতে গাছের চারা বসিয়ে তাতে ৮ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি মাত্রার আর্সেনিক ও ফসফরাস মিশ্রিত জল দিয়ে সেচ করা হয় ১৭০ দিন ধরে। ধান পাকার পরে দেখা যায় ধান গাছের বৃদ্ধি কম হয়েছে। সেই সাথে ফসলের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে। ধানের রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ধানের মধ্যে আর্সেনিকের পরিমাণ ১ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি থেকে কম যা জৈব আর্সেনিকের অনুমোদিত মাত্রার নীচেই। কিন্তু ধানের শিকড়ে এবং খড়ের মধ্যে আর্সেনিকের পরিমাণ ৯১.৮থেকে ১০৭.৫ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি যা অনুমোদিত মাত্রার থেকে অনেক বেশী। গবাদি পশুরা এই খড় খেলে তাদের শরীরে যে আর্সেনিক প্রবেশ করবে তা খাদ্য শৃঙ্খলে অবশেষে মানুষের শরীরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা আছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় জলঙ্গী এবং ডোমকল ব্লকে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে দীর্ঘকাল হল (২০ বছর)। এই এলাকার মানুষ যেমন দীর্ঘকাল ধরে আর্সেনিক মিশ্রিত জল ব্যবহার করে আসছেন তেমনই তারা তাদের খাদ্য বস্তুর সাথে আর্সেনিক গ্রহণ করছেন কিনা এই নিয়ে একটি সমীক্ষা চালানো হয়। দেখা গেছে বিভিন্ন খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক রয়েছে। এর পরিমাণ:-

শাক সব্জি	১৯ থেকে ২০ মি: গ্রা: প্রতি কেজি
চাল ও বেকারী জাত খাদ্য	১৩০ এবং ১৭৯ মি: গ্রা: প্রতি কেজি

মশলা	২০২ মি: গ্রা: প্রতি কেজি

বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে বিস্তীর্ণ এলাকায় ধান ক্ষেতে যে সেচ দেওয়া হয় তার একটা বিরাট অংশই আসে ভূগর্ভের জল থেকে। এই জলের উৎসগুলি অনেক জায়গাতেই আজ আর্সেনিক কবলিত। কাজেই এই কৃষিজমির মৃত্তিকাতেও বেশ ভাল পরিমাণে আর্সেনিক রয়েছে। বাংলাদেশের ধানী জমির মৃত্তিকাতে একটি পরীক্ষা চালানো হয়। তার জন্য আর্সেনিক কবলিত এলাকায় সবচেয়ে পুরোনো যে নলকূপ থেকে সেচ হয় তার সেচ এলাকার মাটিতে আর্সেনিকের পরিমাণ দেখা গেল ৪৬ মিলিগ্রাম প্রতি গ্রাম শুকনো মাটিতে রয়েছে। এখানকার ধানেও বেশ ভাল পরিমাণ আর্সেনিক পাওয়া গেল।

আর্সেনিক চক্র

আর্সেনিকের জৈব যৌগগুলি ক্রমাগত অজৈব পরিবেশে গিয়ে অজৈব যৌগনির্মাণ করছে আবার অজৈব যৌগ জীববলয়ের মধ্যে ফিরে গিয়ে উল্টোটাও ঘটাচ্ছে। এর ফলে একটি প্রাকৃতিক আর্সেনিক চক্র চলছে। বিভিন্ন বিজ্ঞানী এই চক্রকে নানা ভাবে দেখিয়েছেন। ফ্রস্ট(১৯৬৭) ফার্গুসন ও গেভিস (১৯৭২), স্যান্ডবার্গ ও এলাওয়ে (১৯৬৮) এঁরা যে সব আর্সেনিক চক্রের কথা চিন্তা করেছেন তার ওপর ভিত্তি করে একটি সহজ আর্সেনিক চক্র রচনা করা হয়েছে।

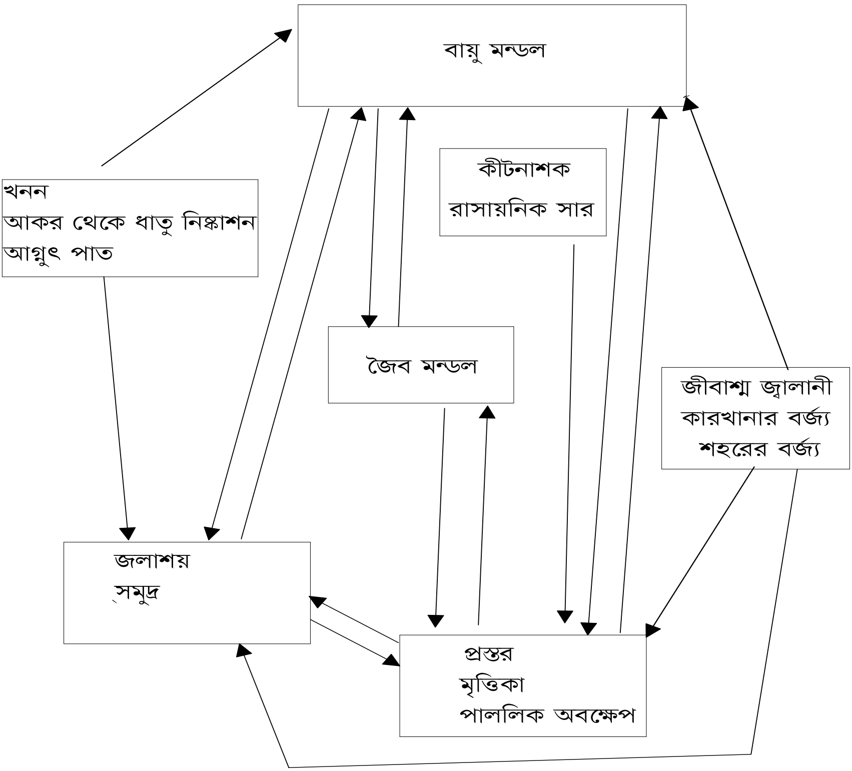
আর্সেনিক চক্র
বায়ু মন্ডল
খনন
আকর থেকে ধাতু নিষ্কাশন
আগ্নুৎ পাত
কীটনাশক
রাসায়নিক সার
জৈব মন্ডল
জীবাশ্ম জ্বালানী
কারখানার বর্জ্য
শহরের বর্জ্য
জলাশয়
সমুদ্র
প্রস্তর
মৃত্তিকা
পাললিক অবক্ষেপ

চিত্র ১: প্রাকৃতিক আর্সেনিক চক্র

আর্সেনিক চক্রের একেবারে নীচে রয়েছে আর্সেনিকের মূল ভান্ডার শিলা স্তর। এই শিলাস্তর ক্ষয় হয়ে মৃত্তিকা এবং অবক্ষেপ হিসাবে নীচু এলাকায় জমা হয়। এখান থেকে বা শিলাস্তর থেকে আর্সেনিক ধুয়ে চলে যায় সমুদ্র বা জলাশয়ে। মাটি থেকে এবং সমুদ্র বা জলাশয় থেকে আর্সেনিক যায় বাতাসে এবং জৈব মন্ডলে। বাতাস থেকেও প্রাণীরা শ্বাসের সাথে আর্সেনিক গ্রহণ করে। মানুষের কাজের জন্য অর্থাৎ খনন, ধাতু নিষ্কাশণ বা কয়লার দহন, কারখানার বর্জ্য , ও নাগরিক বর্জ্য এই সব কারণের জন্য আর্সেনিক বায়ুমন্ডলে, জলে ও মাটিতে চলে আসে। বাতাস থেকে বৃষ্টির সাথে মাটিতে আর্সেনিক ঝরে পড়ে। জীব দেহের পচন ও রেচন প্রক্রিয়ার দরুন জীব দেহ থেকে আর্সেনিক আবার মাটিতে চলে আসে। এই ভাবে পাথর, মাটি, জল, বাতাস ও জীবদেহের মধ্যে একটা আর্সেনিকের রাসায়নিক চক্র সবসময় চলছে।

ভূগর্ভস্থজলে আর্সেনিক

পশ্চিমবঙ্গে সন্ধান

১৯৮৩ সালে কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনে কয়েকজন রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন। এদের প্রত্যেকেরই শরীরে চর্ম রোগ হয়েছে, যা কোনও গতানুগতিক ওষুধে সারছেনা। এই রোগীদের পরীক্ষা করে ড: কে সি সাহা দেখেন যে এদের শরীরে যে সব উপসর্গ দেখা দিয়েছে তা আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার মত। তিনি এদের নানা ভাবে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে এদের এই উপসর্গগুলি আর্সেনিকের ধীর বিষক্রিয়ার ফল। কিন্তু এই আর্সেনিকের উৎস কোথা থেকে তা তখনও নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করা হয়নি। এই সব রোগীরা সবাই ছিল চব্বিশ পরগণা জেলার লোক। এর পর মুর্শিদাবাদের রানীনগরের থেকে অনুরূপ কিছু রোগী স্কুল অফ ট্রপিকাল মেডিসিনে ভর্তি হয়। এই রানীনগরের নলকূপের কয়েকটি জলের নমুনা রাজ্য জল অনুসন্ধান অধিকারের পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা যায় সেই জলে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে আর্সেনিক রয়েছে। এর পরবর্তী অধ্যায়ে আর্সেনিক নিয়ে বেশ কিছু হৈ চৈ হয় এবং আরও নানা স্থানে বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, মালদহ ও চব্বিশপরগণা জেলা থেকে শত শত আর্সেনিক রুগীর সন্ধান আসতে থাকে। এই সব এলাকাতেই প্রচুর পরিমাণে নলকূপ রয়েছে এবং প্রতিটি আক্রান্ত ব্যক্তিই এই নলকূপের জল ব্যবহার করে।

প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল এই নলকূপে যে ফিল্টার এবং পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে যে ধাতু আছে তাতে আর্সেনিক সংকর হিসাবে আছে। কিন্তু পরে হিসাব করে দেখা গেল যে পরিমাণ আর্সেনিক এই সব নলকূপ থেকে উঠছে তার পরিমাণ এত বিপুল যে নলকূপের নলের ধাতুর তত্ত্ব বাতিল করে দিতে হল। এর পর ধারণা করা হল কৃষি জমিতে যে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়েছে তার থেকে আর্সেনিক আসতে পারে। কিন্তু সে ধারণাও বাতিল করতে হল এই কারণে যে নলকুপ থেকে যে পরিমাণ আর্সেনিক উঠছে বিশ্বের তাবৎ দেশের সমস্ত কীটনাশক একত্র করলেও তার সমান হবে না।

কাজেই সমস্ত তত্ত্ব বাতিল করে নিশ্চিত হতে হল যে এই আর্সেনিকের উৎস ভূতাত্বিক। অর্থাৎ যে স্তর থেকে জল তোলা হচ্ছে সে স্তরে যে বালুকণা বা কর্দমের কণা আছে তার মধ্যেই আর্সেনিক আছে। এই সময় থেকেই বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন এই আর্সেনিক অনুসন্ধানের কাজে নেমে পড়ে। এই সময়ে ১৯৮৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে একটি আর্সেনিক স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। রাজ্য জল অনুসন্ধান অধিকার, জন স্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, সেন্ট্রাল গ্রাউন্ড ওয়াটার বোর্ড, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন এন্ড পাবলিক হেল্থ, স্কুল অফ ট্রপিকাল

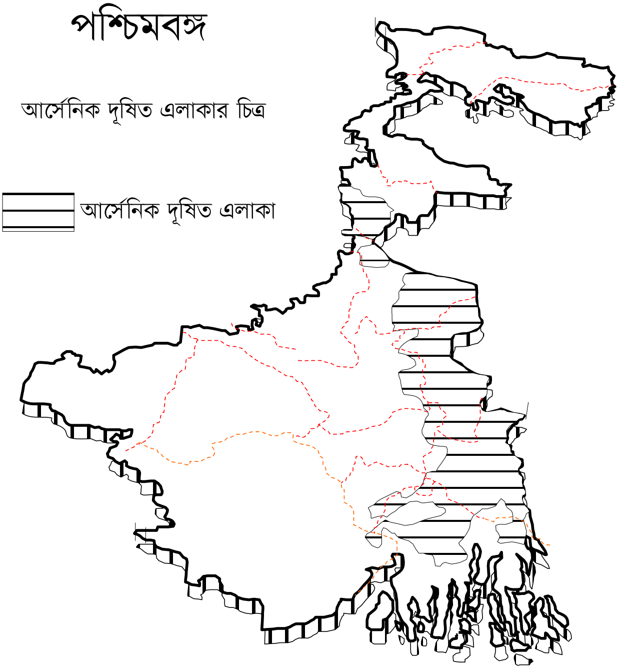

চিত্র ২: পশ্চিমবঙ্গের আর্সেনিক দূষিত এলাকা। সূত্র www.wbwidd.org

মেডিসিন, সেন্টার ফর স্টাডি অফ ম্যান এন্ড এনভায়রণমেন্ট ইত্যাদি সংগঠন এর সদস্য ছিল। এই কমিটি মুর্শিদাবাদ নদীয়া, ও উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় আর্সেনিকের উৎস সন্ধান শুরু করে। আবশ্য রাজ্য জল অনুসন্ধান অধিকার তার আগেই আর্সেনিক অনুসন্ধানের কাজ হাতে নিয়েছিল। এই সব সংগঠনের অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এটা নিশ্চিত ভাবে জানা গিয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে যে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে তার উৎস নি:সন্দেহে ভূতাত্বিক। তাই এই সব আর্সেনিক আক্রান্ত জেলা গুলির ভূতাত্বিক পরিচয় জানা অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় নয়টি জেলা এবং একাশিটি ব্লক থেকে জলে আর্সেনিক পাওয়ার সংবাদ পাওয়া গেছে। তাবে মালদা , মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও উত্তর চব্বিশপরগণার অবস্থা এখন সবচেয়ে করুণ। এই সব জেলার অধিকাংশ ব্লকেই আর্সেনিক রয়েছে।

ভারতের অন্যত্র আর্সেনিকের সন্ধান

ছত্তিশগড়

ভূগর্ভের জলে আর্সেনিকের দূষণের খবর এসেছে ছত্তিশগড় রাজ্যের ডোঙ্গরগড় জেলার উত্তরাঞ্চলের থেকে। এর মধ্যে চৌকি ব্লকটিই সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত। এই এলাকাটি পাহাড় ও শিলাময় হলেও এখানে ভূগর্ভের জলে প্রচুর পরিমাণে লোহা এবং আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। এখানে জলে আর্সেনিক আসার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে ডোঙ্গরগড় আগ্নেয় শিলাস্তরের ক্ষয় ও রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে সেখান থেকে আর্সেনিক মুক্ত হয়ে ভূগর্ভের জলে এসে মিশেছে।

বিহার

বিহারের উত্তরাঞ্চলে গাঙ্গেয় সমভূমির ভূতাত্বিক গঠন প্রায় পশ্চিমবঙ্গের মতই। এখানে অনুসন্ধান করে দেখা গিয়েছে মধ্য গঙ্গা সমভূমিতে সেমরিয়া ওঝা পট্টি গ্রামে ২০৬ টি নলকূপের জলের রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে তার ৫৬.৮ শতাংশ নমুনাতেই আর্সেনিক নিরাপদ মাত্রার থেকে বেশী রয়েছে। ১৯.৮ শতাংশ নমুনাতে ০.৩০ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার পরিমাণ আর্সেনিক রয়েছে। এই গ্রামের ৫৫০ জন মানুষের ডাক্তারী পরীক্ষায় দেখা গেছে ১৩ শতাংশ বয়স্ক মানুষ এবং ৬ শতাংশ শিশু আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত। এই গ্রামের শিশুরা অপুষ্টিরও শিকার। এদের শরীরের বিভিন্ন অংশে বিশেষ করে নখ চুল এবং মূত্রে খুব বেশী পরিমাণে আর্সেনিক রয়েছে।

আর্সেনিকের কবলে বাংলাদেশ

আশির দশকের শেষের দিকে জানা গেল বাংলা দেশের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল আর্সেনিক কবলিত। সত্তরের দশকের বিপুল আন্ত্রিক মহামারীর পরে সে দেশে শতকরা নব্বইভাগ গ্রামের মানুষ নলকূপের জল পান করে। সে সব নলকূপের প্রায় কুড়ি শতাংশ কূপেই আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে নির্ধারিত মাত্রার থেকে বেশী। সে দেশে বেসরকারী এবং সরকারী সংগঠন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই আর্সেনিকের মোকাবিলায় নেমে পড়ল। ১৯৯৩ সাল থেকে বাংলাদেশের আর্সেনিক নিয়ে সারা বিশ্বে সোরগোল পড়ে গেল এবং এই দুষণকে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে চিহ্নিত করা হল। বাংলাদেশের সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ মানুষ এই আর্সেনিকের দুষণের আওতাভুক্ত। ইতিমধ্যেই হাজার হাজার মানুষ এই আর্সেনিকের দূষণ জনিত রোগ আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত। বাংলাদেশের ৬৯ টি জেলার মধ্যে ৬৪ টিতেই ভূগর্ভের জলে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। গ্রামের গরীব এবং আর্থসামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া মানুষেরাই প্রধানত: এই বিষক্রিয়ার শিকার হয়েছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আর্সেনিক জনিত ক্যানসার রুগীর সন্ধান সেভাবে পাওয়া যায়নি। কিন্তু ক্যানসার প্রকাশ পেতে এক দীর্ঘ সময় ধরে আর্সেনিক যুক্ত জল ব্যবহার করা দরকার। আশঙ্কা করা হচ্ছে আর কয়েক

বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ আর্সেনিক ক্যানসার রুগীতে ভরে যাবে। দু:খের বিষয় আর্সেনিক যুক্ত জলপানের সাথে শরীরের বিভিন্ন অংশের ক্যানসারের কি সম্পর্ক আছে তা জানা যায়নি। নীচে বাংলাদেশের আর্সেনিক চিত্র দেখানো হল।

বাংলাদেশে ব্রিটিশ জিওলজিকাল সার্ভে ও বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ যুগ্ম ভাবে বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা ও আক্রান্ত জনগনের ওপর এক সমীক্ষা শুরু করে ১৯৯৮ সালে। যুক্ত রাজ্য ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এর ব্যায়ভার বহন করেন। এই সমীক্ষার দুটি লক্ষ্য ছিল ১) বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিক দূষণের সমস্যার মাত্রা নির্ণয় করা ও আর্সেনিক দূরীকরণ পরিকল্পনাকে সাহায্য করা। ২) বাংলাদেশের ভূসলিলাধারের আর্সেনিক দূষণের কারণ খুঁজে বের করা। এর জন্য তিনটি স্তরে অর্থাৎ জাতীয়, জেলা ও উপজেলা স্তরে কাজ শুরু করা হয়। এর জন্য জাতীয় স্তরে ৬১ টি জেলায় কাজ শুরু করা হয়। এই স্তরে ৩৫৩৪ টি নলকূপের জলের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়।

বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষিত এলাকার চিত্র

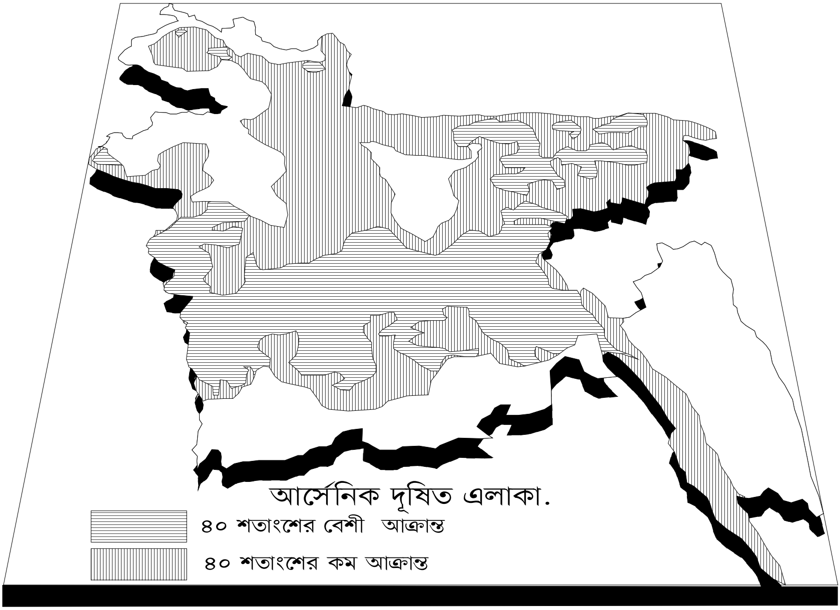

এই সমীক্ষা ছাড়াও আরও বহু সংস্থা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা আর্সেনিক কবলিত জেলাগুলিতে সমীক্ষা করেছেন। এই সব প্রচেষ্টার সম্মিলিত ফলাফল থেকে জানা গিয়েছে বাংলাদেশের মেঘনা নদীর মোহানায় এবং দক্ষিণপশ্চিম দিকের জেলাগুলি সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত। চাঁদপুর, নোয়াখালি, লখিমপুর ও মাদারিপুরের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। এই জেলাগুলির সর্বত্রই মোটামুটি ভাবে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু তার মধ্যেও কয়েকটি অঞ্চল মারাত্মক ভাবে আক্রান্ত। তবেও এটা সত্যি কথা যে শুধু মাত্র অল্প কয়েক

হাজার নলকূপের সমীক্ষা করে কোনও বৃহৎ সিদ্ধান্তে আসা যায় না, তবুও বলা যায় প্রতিটি চিহ্নিত জেলাতেই আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। তবে এই সব জেলার মোট নলকূপের ২৫ শংতাশে আর্সেনিক থাকতে পারে। চাঁদপুরে ৯০ শতাংশ এবং ঠাকুরগাঁ, পাঁচগড় ও রংপুরে ৩ শতাংশে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে।

বাংলাদেশের আর্সেনিকের অবস্থান নিয়ে যেটুকু ভূতাত্বিক সমীক্ষা হয়েছে তা থেকে বরেন্দ্রভূমির নীচে যে পুরাতন পলির স্তর আছে তা আর্সেনিক মুক্ত বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু তার আশেপাশের প্লাবনভূমিতে আর্সেনিক থাকার সম্ভাবনা খুবই বেশী। ১৫০ থেকে ২০০ মিটার নীচে যে সলিলাধার রয়েছে তাও সম্ভবত: আর্সেনিক মুক্ত। ঢাকা শহরে জল উত্তোলন করা হয় পুরাতন পলি ধুপি টিলা বালুকার স্তর থেকে। এই জল বহুবার পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এতে কোনও আর্সেনিক পাওয়া যায়নি। কিন্তু ঢাকা থেকে কিছু দক্ষিণে গ্রামাঞ্চলে অল্প গভীরতার নলকূপের জলে আর্সেনিক রয়েছে বিপজ্জনক মাত্রায়।

বাংলাদেশে কত লোক এই আর্সেনিকের দূষণে আক্রান্ত তার সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন। বিশ্বের সবচেয়ে জনাকীর্ণ এই দেশে ৯০ শতাংশ মানুষ নলকূপের জল পান করে। এই নলকূপ গুলির একটা বৃহৎ অংশ, বিশেষ করে দক্ষিণ বাংলাদেশের জেলাগুলিতে অন্তত ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ আর্সেনিক যুক্ত জল উত্তোলন করে। কাজেই অন্তত: বলা যায় ২ থেকে ৩ কোটি মানুষ আর্সেনিক মিশ্রিত জল পান করছে।

এক নজরে বাংলাদেশের আর্সেনিক সমস্যা

বাংলাদেশে মোট জেলার সংখ্যা	৬৪
বাংলাদেশের মোট এলাকা	১৪৮৩৯৩ বর্গ কিলোমিটার
জনসংখ্যা	১২ কোটি
মাথাপিছু গড় আয়	২৬০ ডলার
মোট নলকূপের সংখ্যা	৪০ লক্ষ
আর্সেনিকের সমীক্ষা হয়েছে	৬৪ টি জেলায়
যতগুলি জেলায় আর্সেনিক নিরাপদ মাত্রার থেকে বেশী পাওয়া গিয়েছে	৫৯
এই ৫৯ টি জেলার মোট আয়তন	১২৬১৩৪ বর্গ কিলোমিটার
আর্সেনিকের কবলিত জেলায় লোকসংখ্যা	সাড়ে সাত কোটি
আর্সেনিকের কবলে মানুষের সংখ্যা	২.৪ কোটি
আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রুগী	৭০০০

Source: BBS, Dhaka Community Hospital, NIPSOM

বিশ্ব জোড়া আর্সেনিকের ফাঁদ

আর্সেনিক আজ শুধুমাত্র ভারত বা বাংলাদেশেই নয় বিশ্বের অনেক দেশেই ভূজলে আর্সেনিক ধরা পড়েছে। এসিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও বহু

জায়গায় আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। এই আর্সেনিক মিশ্রিত জল পান করে আর্সেনিকোসিসের শিকার হয়েছে বহু মানুষ। তাই পৃথিবীর প্রায় সব জায়গায়ই আজ আর্সেনিক. দূষণে দূষিত। বিভিন্ন দেশে কি মাত্রায় আর্সেনিক পাওয়া গেছে এবং তার দরুণ কত মানুষ অসুস্থ হয়েছে তার একটি বিবরণ নীচে দেওয়া হল। এই প্রতিটি দেশই বিপুল পরিমাণে ভূগর্ভের জল উত্তোলন করে।

আর্জেন্টিনা

বিশ্বে আর্সেনিক দূষণের প্রথম খবর আসে আর্জেন্টিনা থেকে। একানকার জলে আর্সেনিকের পরিমাণ ০.১ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার থেকে ০.২ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার। প্রায় ২০,০০০ মানুষ আর্সেনিকোসিসের শিকার। ১৯৩৮ সাল থেকে এই দেশে এই নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। আজ এই বিপদ অনেকটা আয়ত্তে এসেছে।

উত্তর মেক্সিকো

প্রায় ১,২৭,০০০ মানুষ আর্সেনিক দূষিত জল পান করে থাকে। ভূগর্ভের জলে আর্সেনিকের পরিমাণ ০.১ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার থেকে ০.৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার যা নিরাপদ মাত্রার থেকে প্রায় দশ গুণ বেশী। এই দেশে আর্সেনিক ঘটিত ক্যানসারে মারা গিয়েছে এমন খবর পাওয়া গিয়েছে।

চিলি

এই দেশে জলে আর্সেনিক আছে জানা যায় ১৯৫৭ সালে। প্রথম আর্সেনিকোসিসের রুগী ধরা পড়ে ১৯৬২ তে। পানীয় জলে আর্সেনিকের মাত্রা ০.৮ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার থেকে ১.৩মিলিগ্রাম প্রতি লিটার। দাবী করা হয় ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সালে এই দেশে ৭ শতাংশ লোকের মৃত্যু ঘটেছে আর্সেনিক যুক্ত জল পান করে। এই দেশে জলকে আর্সেনিক মুক্ত করার জন্য যে আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বসানো হয়েছিল তা আর্সেনিকের মাত্রা ০.৪ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার পর্যন্ত কমিয়ে আনতে পেরেছিল।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

এখানে পানীয় জলে আর্সেনিকের মাত্রা ০.০৪৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার থেকে ০.০৯২ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার। প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষ এই জল পান করে থাকে। এর ফলে চামড়া ও স্নায়ুর রোগ এবং মূত্রাশয়ের ক্যান্সারের রুগীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যে সব রাজ্য এই দুষণে সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত তা হল:- ১) ক্যালিফোর্নিয়া, ২) ম্যাসাচুসেটস ৩) টেনেসি, ৪) মিশিগান ও ৫) উটা

তাইওয়ান

১৯৫৮ সালে তাইওয়ানে পানীয় জলে আর্সেনিক প্রথম পাওয়া যায়। ৮৩,০০০ নলকূপের মধ্যে ১৯ শতাংশই আর্সেনিক দুষ্ট। প্রায় এক লক্ষ মানুষ এদেশে আর্সেনিকোসিসের শিকার। ১৯৫৭ সালে প্রচুর আর্সেনিক দূরীকরণ প্ল্যান্ট বসানো হয়। তার ফলে ৯০ শতাংশ মানুষ আর্সেনিক মুক্ত জলের আওতায় চলে আসে।

মঙ্গোলিয়া

এদেশে প্রথম আর্সেনিকোসিসের রুগীর সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৯৮ সালে। সেই বছরের সমীক্ষায় জানা যায় প্রায় তিন লক্ষ মানুষ আর্সেনিক দূষিত জল পান করে। এদের মধ্যে ১৭৭৪ জন নিশ্চিতভাবে আর্সেনিকোসিসের শিকার। প্রায় ৯০ শতাংশ নলকূপের জলেই আর্সেনিকের পরিমাণ ০.০৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারের থেকে বেশী। সবচেয়ে বেশী যে পরিমাণ আর্সেনিক জলে পাওয়া গিয়েছে তা হল ১.০৮৮ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার। এই দেশের আর্সেনিক দূরিকরণের পরিকল্পনা অর্থাভাবের জন্য সফল হতে পারছেনা। এসিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক নামক একটি সংস্থা অবশেষে জাপানের ফান্ড ফর গ্লোবাল এনভায়রণমেন্ট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ১৯৯৬ সালে এই দেশের ১৫ টি গ্রামে সমীক্ষা করে।

থাইল্যান্ড

১৯৮৭ সালে প্রথম আর্সেনিকোসিসের রুগীর সন্ধান পাওয়া যায়। প্রায় ১৮০০০ মানুষ এই দূষণের আওতায় রয়েছে। আর্সেনিক বিষক্রিয়ার জন্য চামড়ার ক্যানসার রুগী ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা গিয়েছে। মাউন্ট ইপোতে যে জিওথার্মাল প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে তার জন্য আশেপাশের জলের উৎসগুলো আর্সেনিক দূষিত হয়ে পড়েছে। একটি সরকারী পেট্রোলিয়াম কম্পানি যারা ওই প্ল্যান্ট বসিয়েছিল, তারা এখন আর্সেনিক দূর করার চেষ্টা করছে।

চীন

চীনে প্রথম আর্সেনিকোসিসের রুগীর সন্ধান পাওয়া যায় ১৯৫৩ সালে। ১৯৬৪ সালে এ বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করা হয়। ১৯৯১ থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে ১৫৪৬ জন আর্সেনিকোসিসের রুগীর খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। অতিরিক্ত কয়লার দহনের জন্য এই দূষণ সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবী করা হয়েছে। এই দূষণ ৭ শতাংশ মাত্র জল থেকে হয়েছে। ৮৮ শতাংশই হয়েছে খাবার থেকে।

জাপান

১৯৭১ সালে জাপানের দুটি গ্রামে আর্সেনিক দূষণ ঘটেছে বলে সন্দেহ করা হয়। ১৯৯৫ সালে ২১৭ জন আর্সেনিকোসিসের রুগীকে সনাক্ত করা হয়। ধাতু এবং কয়লা খনি গুলোই এই দূষণের জন্য দায়ী বলে দাবী করা হয়েছে।

ভিয়েতনাম

হ্যানয় বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ২০০১ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। তাতে বলা হয়েছে হ্যানয়ের আশে পাশে পানীয় জলে আর্সেনিকের মাত্রা বিপ্জ্জনক মাত্রার অনেক ওপরে। ৩০ থেকে ১২০ ফুট গভীরতার ৬৮ টি নলকূপের শতকরা ৫০ টিতে ০.০৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার থেকে শুরু করে ৩.০ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার পর্যন্ত আর্সেনিক রয়েছে।

ঘানা

ব্রিটিশ একটি সংস্থার (UK-DFID) আর্থিক সহযোগিতায় ১৯৯২ ও ১৯৯৫ সালে ওবুয়াসি শহরের চারদিকে ঝরণা, কুয়ো এবং নলকূপের জলের রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়। অগভীর নলকূপের জলে এবং বোর ওয়েলের জলে ০.১৭৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া যায়। ঝরণার জলেই সবচেয়ে বেশী আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। গভীর এবং অগভীর নলকূপের জলেও মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

নেপাল

নেপালের তরাই এলাকায় দেশের প্রায় ৪৭ শতাংশ লোকের বাস। এদের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশেরই প্রধান জলের উৎস নলকূপ। তরাই অঞ্চলের ২০ টি জেলার এক কোটি মানুষের জন্য বিভিন্ন সংস্থা প্রায় দু লক্ষ অগভীর নলকূপ স্থাপন করেছে। সম্প্রতি এই সব নলকূপের জলে আর্সেনিক দেখা দেওয়ায় এক জাতীয় স্বাস্থ্য সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। ১৫০০০ নলকূপের জল পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে ২৩ শতাংশ নলকূপের জলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদন্ড অনুসারে ০.০১ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারের থেকে বেশী এবং ৫ শতাংশ নলকূপের জলে আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসারে ০.০১ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারের থেকে বেশী আর্সেনিক রয়েছে। এর ফলে প্রায় ২০ শতাংশ মানুষ আর্সেনিক দূষণের আওতায় এসে গিয়েছে। বহু লোক ইতিমধ্যেই আর্সেনিকোসিসের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ চর্ম রোগের শিকার হয়েছেন। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা ইতিমধ্যেই এর মোকাবিলায় নেমে পড়েছে।

বিশ্ব জুড়ে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা আন্তর্জাতিক স্তরে আর্সেনিক নিয়ে কাজ করছেন। এঁরা প্রধানত আর্সেনিক আক্রান্ত দেশে তথ্যানুসন্ধান, চিকিৎসা, আর্সেনিক দূরীকরণকর্মসূচী, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কাজের সাথে যুক্ত। নীচে কয়েকটি এই ধরণের সংস্থা

বা সংগঠনের নাম দেওয়া হল। এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে। ওয়েবসাইটের একটি পৃথক তালিকা দেওয়া হল।

১) আমেরিকান ওয়াটার ওয়ার্কস রিসার্চ ফাউন্ডেশন (American Water Works Research Foundation (AWWARF) for "arsenic")
২) আর্সেনিক প্রোজেক্ট এট দি হাভার্ড স্কুলস (The Arsenic Project at the Harvard Schools)
৩) ইউ এস ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ এনভায়রণমেন্টাল হেল্থ সায়েন্সেস (U.S. National Institute of Environmental Health Sciences)
৪) এনভায়রণমেন্টাল নিউজ নেটওয়ার্ক (Environmental News Network)
৫) সেনটার ফর হেল্থ এন্ড পপুলেশন (Center for Health and Population)
৬) ইউ এস এজেন্সি ফর টক্সিক সাবস্টেন্স এন্ড ডিজিজ রেজিস্ট্রি (US Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR)
৭) ইউ এস এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি (US Environmental Protection Agency)
৮) ইউ এস জিওলজিকাল সার্ভে (US Geological Survey (USGS) for "arsenic")
৯) ইউ এস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এনভায়রণমেন্টাল হেল্থ সায়েনসেস (US National Institute of Environmental Health Sciences)
১০) বিশ্ব ব্যাঙ্ক (World Bank)
১১) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization 'WHO")
১২) ব্রিটিশ জিওলজিকাল সার্ভে (British Geological Survey)

এ ছাড়াও প্রায় সব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েই আর্সেনিক দূষণের ওপর নিরন্তর গবেষণা চলছে। এই সব গবেষণার ফলাফল নিয়মিত ভাবে বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকা, বিজ্ঞান সম্মেলন ও নানা ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হচ্ছে। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ই নিজের দেশ ছাড়াও আন্তর্জাতিক স্তরে আর্সেনিক দূষণ নিয়ে কাজ করছেন।

আর্সেনিক থেকে অসুখ

পরিবেশের থেকে মানুষের শরীরে আর্সেনিক প্রবেশের সাধারণ দুটি রাস্তা হল খাদ্য বা পানীয়ের মাধ্যমে অথবা শ্বাসের সাথে গ্রহণ। চামড়ার সংস্পর্শ থেকেও খুব সামান্য পরিমাণে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করতে পারে। ভারতবর্ষে জলে আর্সেনিকের অনুমোদিত মাত্রা হল ০.০৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই মাত্রা ঠিক করেছেন ০.০১ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারে। ০.০৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারের থেকে বেশী পরিমাণে আর্সেনিক জলে থাকলে সেই জল পানের অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয় এবং সেই জল নিয়মিত পান করলে শরীরে আর্সেনিক জনিত নানা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তবে এই আর্সেনিকের প্রভাব সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রেই যে এক রকম হবে তা নয়। ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, শরীরের কোনও প্রত্যঙ্গ আগে থেকেই অসুস্থ বা দূর্বল ছিল কিনা, খাদ্যাভ্যাস, ইত্যাদি বহু বিষয়ের প্রভাব শরীরে আর্সেনিক জনিত উপসর্গ উৎপন্ন হওয়ার ওপর প্রভাব ফেলে।

সাধারণ ভাবে বিষ হিসাবে অধিক মাত্রায় আর্সেনিক খেলে শরীরে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার তাৎক্ষনিক উপসর্গগুলি দেখা দেয়। এগুলো হল পেটের গন্ডোগোল, বমি, ইত্যাদি। কিন্তু এই বিষের পরিমাণ খুব বেশী হয়ে গেলে মৃত্যুও হতে পারে।

মানুষ দৈনিক ২০ মাইক্রোগ্রাম অজৈব আর্সেনিক এবং ৫০ মাইক্রোগ্রাম পর্যন্ত মোট আর্সেনিক সহ্য করতে পারে। আর্সেনিকের দীর্ঘস্থায়ী উপসর্গ (chronic) দেখা দেয় যখন অনেকদিন ধরে জল বা অন্য কোনও খাদ্যবস্তুর সাথে বা শ্বাসের সাথে এর থেকে বেশী পরিমাণে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করে।

আর্সেনিক রক্তে প্রবেশ করার পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে তা টিসু তে চলে যায়। তবে অনেক সময় রক্তে আর্সেনিকের পরিমাণ বেড়ে যায় যদি আর্সেনিক গ্রহণ খুব বেশী মাত্রায় হয়ে থাকে। মুত্রে আর্সেনিকের পরিমাণ নির্ধারণ আর্সেনিক বিষক্রিয়া নির্ণয়ের প্রথম উপায়। আর্সেনিক বিষক্রিয়া আমাদের শরীরে বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে কি ভাবে প্রভাব ফেলে তা নীচে দেওয়া হল।

উদর ও অন্ত্রের ওপর প্রভাব

দূর্ঘটনা বা ইচ্ছাকৃত ভাবে কেউ অধিক পরিমাণে আর্সেনিক গ্রহণ করলে প্রথমেই তা অন্ত্র ও পরিপাক যন্ত্রের ওপর আক্রমণ করে। অন্ত্রের মিউকাস মেম্ব্রেন আক্রান্ত হয়। ডাইরিয়া, পেটের বেদনা, বমি এই সব উপসর্গ দেখা দেয়। আর্সেনিক কম পরিমাণে খেলে মুখের ভেতরে শুষ্ক ভাব ও খিঁচুনি, বুক ধরফর এই সব উপসর্গ দেখা দেয়। কিন্তু অতি অল্প পরিমাণে অর্থাৎ জলের সাথে যে পরিমাণ আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করে তাতে অন্ত্রের ওপর তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়না।

শ্বাস যন্ত্রের উপসর্গ

খনি বা ধাতু নিষ্কাশনের কারখানায়, যারা কাজ করে তারা অনেকেই শ্বাসের সাথে আর্সেনিক গ্রহণ করে। এর ফলে শ্বাস যন্ত্রের নানা রকম উপসর্গ দেখা দেয়, যেমন ফ্যারেনজাইটিস, ল্যারিন্জাইটিস, ব্রঙ্কাইটিস, সর্দি ইত্যাদি। আর্সেনিক শ্বাস নালির পীড়া যেমন হাঁপানি সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি করতে পারে। ১ থেকে তিন সপ্তাহ এই ভাবে শ্বাসের সাথে আর্সেনিক গ্রহণ করায় শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে তাদের নাক দিয়ে অথবা কফের সাথে রক্ত পড়ছে।

চর্ম রোগ

শরীরে আর্সেনিক জমা হওয়ার একটি প্রধান জায়গা হচ্ছে চামড়া। শুধু খাদ্য বা পানীয়ের সাথে নয় আর্সেনিক মিশ্রিত ধুলো এবং বাতাসের দীর্ঘকাল সংস্পর্শে থাকলে চামড়ার ওপর আর্সেনিকের বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। আর্সেনিক দূষিতজল পানের প্রথম চিহ্ন চামড়ায় ফুটে ওঠে কলো বা সাদা ছিট হিসাবে। এগুলোই পরে কেরাটোসিস, ও আরও জটিল চর্মরোগের চেহারা নেয়।

রক্তের ওপর প্রভাব

আর্সেনিক দূষিতজল বা খাদ্য দীর্ঘকাল ব্যবহার করলে রক্তের ওপর তার যে প্রভাব পড়ে তাতে বিভিন্ন ধরণের এনিমিয়া দেখা দেয়। আর্সিন গ্যাস খুব দ্রুত লোহিত কণিকার এনজাইমের সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং কিছুকাল পরে হঠাৎ এনিমিয়া, হিমাচুরিয়া, সংজ্ঞা লোপ ইত্যাদি উপসর্গ প্রকাশ পায়।

লিভার

লিভারে আর্সেনিক দীর্ঘকাল ধরে জমা হতে থাকে যদি নিরাপদ মাত্রার থেকে বেশী আর্সেনিক প্রতিদিন শরীরে প্রবেশ করে। কয়েক মাস বা কয়েক বছর পরে লিভারের নানা অসুখ দেখা দেয়। তার মধ্যে প্রধান হল লিভারের বৃদ্ধি এবং জন্ডিস।

কিডনি

আর্সেনিক শরীর থেকে বের করার প্রধান পথ হল বৃক্ক। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক লিভারের মতই কিডনি বা বৃক্কে সঞ্চিত হয়। এর ফলে একিউট টিউবুলার নেক্রোসিস এবং কিডনির অকর্মন্যতা জন্মাতে পারে। লোহিত কণিকার সাথে যুক্ত আর্সেনিক এই উপসর্গ সৃষ্টি করে।

হৃদযন্ত্র

হৃদযন্ত্র এবং সংলগ্ন আর্টারি গুলো আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর্সেনিক দুষ্ট জল পান করে মায়োকার্ডিয়ার প্রকাশ ইসিজি তে ধরা পড়েছে। আর্সেনিক দূষণে হৃদযন্ত্রের অনেক রোগের মধ্যে আর্টারির দেওয়াল মোটা হয়ে যাওয়া, ইস্কিমিয়া ও ব্ল্যাকফুট ডিজিজ অতি সাধারণ। চিলি, তাইওয়ান আর্জেন্টিনার খনি শ্রমিকদের মধ্যে ও সুইডেনের কাঁচের কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে হৃদযন্ত্রের অসুখে মৃত্যুর হার খুব বেশী।

স্নায়ু

আমাদের স্নায়ুযন্ত্রের কেন্দ্র এবং বহিঃ স্নায়ুকোষ আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত হতে পারে। তাৎক্ষনিক (Acute) আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় নিউরোপ্যাথির উপসর্গ প্রকাশ পায়। চেকোস্লাভাকিয়ার একটি আর্সেনিক যুক্ত কয়লা দহনকারী কারখানার কাছে বসবাসকারী শিশুদের শ্রবণ শক্তি হ্রাস পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কর্কট রোগ

প্রায় ১০০ বছর আগে থেকে লক্ষ্য করা গেছে যে সব রোগী বিভিন্ন রোগে দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিক যুক্ত ওষুধ ব্যবহার করেছে তাদের চামড়ায় ক্যানসার দেখা দিয়েছে। এই ক্যানসার চামড়ার অন্যন্য উপসর্গের সাথে দেখা দেয়। খনি শ্রমিক এবং আর্সেনিক যুক্ত ওষুধ ও কীটনাশকের সাথে যুক্ত শ্রমিকেরা অনেক গুণ বেশী ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। মিশিগান শহরে যে সব শ্রমিকেরা আর্সেনিক যুক্ত কীটনাশক প্যাকিং এর কাজে যুক্ত তাদের অনেকেরই বুকে ক্যানসার দেখা দিয়েছে। পানীয় জলে আর্সেনিক থেকে দীর্ঘকাল আর্সেনিক গ্রহণ করলে সেই আর্সেনিকের সম্পূর্নটা শরীর থেকে বের হতে পারে না এবং তার একটা অংশ চামড়ায় জমে যায়। শুডু চামড়া নয় লিভার, ক্ষুদ্রান্ত্র, মুত্রাশয়, এবং কিডনির ক্যানসারও এই জলের আর্সেনিক থেকে হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরণের ক্যানসার রুগি সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এদের মধ্যে মারা যাওয়া রুগীর সংখ্যাও কম নয়।

জলবাহিত আর্সেনিক থেকে রোগ

জলবাহিত আর্সেনিক জনিত রুগির সন্ধান শুধু ভারত বা বাংলাদেশেই নয় পৃথিবীর বহু জায়গাতেই পাওয়া গিয়েছে। সারাবিশ্বে প্রায় কয়েক কোটি মানুষ এই বিষের কবলে চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯৮৪ সাল থেকেই আর্সেনিকের দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়ায় যে সব রোগ উৎপন্ন হয় তা নিয়ে নানা গবেষণা চলছে। ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিকাল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ, কলকাতা ২৪৮ জন রুগীর ওপর সমীক্ষা করে দেখেন যে এদের শরীরের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ এই আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। এইসব রুগীদের(৯৪.৩%) চামড়ার বর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে, হাত ও পায়ের স্ফিতি দেখা দিয়েছে (৬৫.৩%) , দেখা দিয়েছে শ্বাস জনিত পীড়া (৬২.৫%) ও রক্তাল্পতা (৪৩.৯%) । এ ছাড়া গ্যাঙগ্রিণ এবং কিডনীর ক্যানসার কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে।

আর্সেনিক যখন জলের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে তার পরিমাণ অতি সামান্য হলেও তা শরীরের মেটাবলিক পদ্ধতির মধ্যে অংশ গ্রহণ করে শরীরের কোষ গুলিকে আশ্রয় ও আক্রমণ করে। এই কাজ সে করে এত ধীরে যে শরীরে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া প্রকাশিত হতে বেশ কয়েক বছর পার হয়ে যায়। ড: ক্ষিতিশ চন্দ্র সাহা আর্সেনিক বিষক্রিয়া বা আর্সেনিকোসিসকে চারটি পর্যায় এবং সাতটি ধাপে ভাগ করেছেন। এরা হল:

প্রথম পর্যায় প্রথম ধাপঃ কোনও ধরণের উপসর্গ এই সময়ে দেখা দেয় না । কিন্তু মুত্রের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক পাওয়া যায়। এর পরবর্তী পর্যায়ে চুলে এবং নখে আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়ে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে চারটি ধাপঃ ১) মেলানোসিস ২) হাত ও পায়ের ছিট পড়া কেরাটোসিস ৩) হাত ও পায়ের পাতায় ডিফিউস কেরাটোসিস ৪) দেহের উর্ধাংশের কেরাটোসিস।

তৃতীয় পর্যায় ও ষষ্ঠ ধাপেঃ শরীরের অন্যান্য উপসর্গ গুলো যেমন শ্বাস কষ্ট, লিভারের স্ফিতি ইত্যাদি দেখা দেয়।

পঞ্চম পর্যায় ও সপ্তম ধাপ হল ক্যানসারের অবস্থা।

আর্সেনিকোসিস নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার পর্যায় বোঝার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। চামড়ার মেলানোসিস বা চামড়ার রং কালো হয়ে যাওয়া আর্সেনিকোসিসের প্রথম চিহ্ন। খুব প্রথম পর্যায়ে অবশ্য এই মেলানোসিস ধরা খুব কঠিন। অনুরূপ ভাবে খুব সামান্য কেরাটোসিস ধরাও খুব কঠিন। একই সাথে মেলানোসিস ও কেরাটোসিস দেখা দিলে শরীরের নখ ও চুল পরীক্ষা করে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয় করা দরকার।

পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষিত এলাকার ভূতাত্বিক প্রেক্ষাপট

পশ্চিমবঙ্গ আর্সেনিক দূষিতএলাকা এবং বাংলাদেশের আর্সেনিক দূষিত এলাকার ভূতাত্বিক গঠন একই রকম। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলা দেশের একটা বিরাট অংশ গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র থেকে অব:ক্ষেপিত পলি দিয়ে গঠিত। এই এলাকাকে একত্রে বেঙ্গল বেসিন বলা হয়। এই বেসিনের নীচু জমিগুলি গঠিত হয়েছে কোয়াটার্নারি যুগের অন্তে। তারও পরে প্রায় ১০,০০০ বছর আগে বঙ্গোপসাগরের পশ্চাদপসারণের ফলে হিমালয় এবং রাজমহল থেকে বয়ে আনা বিপুল পলি এই বদ্বীপ অঞ্চলকে রচনা করে। প্রথম মধ্য হলোসিন যুগে সমুদ্র পৃষ্ঠের উত্থান এই এলাকাকে পুনরায় জলমগ্ন করে দেয়। এর ফলে এক বিস্তীর্ণ এলাকায় জলাভূমি তৈরী হয়। পুরোনো জারিত পলির ওপর নিম্ন বদ্বীপ জাত কর্দমের স্তর জমে তাকে ঢেকে দেয়। এই সময়ে হিমালয়ের দ্রুত উত্থান ও ক্ষয়জনিত বিপুল পরিমাণে পলি এই দক্ষিনবঙ্গে চলে আসে বিভিন্ন নদীবাহিত হয়ে। কিন্তু এই এলাকার নীচু জমিগুলো জলমগ্ন থাকার জন্য কর্দম ও বালুকার এক মিশ্রিত অবক্ষেপ জমে উঠতে থাকে। এই বালুকর্দম জৈব বস্তুতে সমৃদ্ধ ছিল এবং বিভিন্ন প্রবাহের খাতের মধ্যে লেন্সের মত স্তর গঠন করে জমে উঠতে থাকে। ১০০০০ থেকে ৭৫০০ বছর আগে এই ঘটনা ঘটেছিল। ৭০০০ বছর আগে সমুদ্র আবার সমুদ্র পৃষ্ঠের উত্থান ঘটে। এর

ফল স্বরূপ এই সমগ্র এলাকা এক বিস্তীর্ণ ও পুরু কর্দমের স্তরে ঢেকে যায়। এর ওপর আবার বর্তমানের নদীগুলো পলি বহন করে আনছে। কর্দমের স্তরের মধ্যে পীটের স্তর গড়ে ওঠে। নীচে পশিমবঙ্গের একটি ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র ও ভূগর্ভের একটি ছেদচিত্র দেওয়া হল।

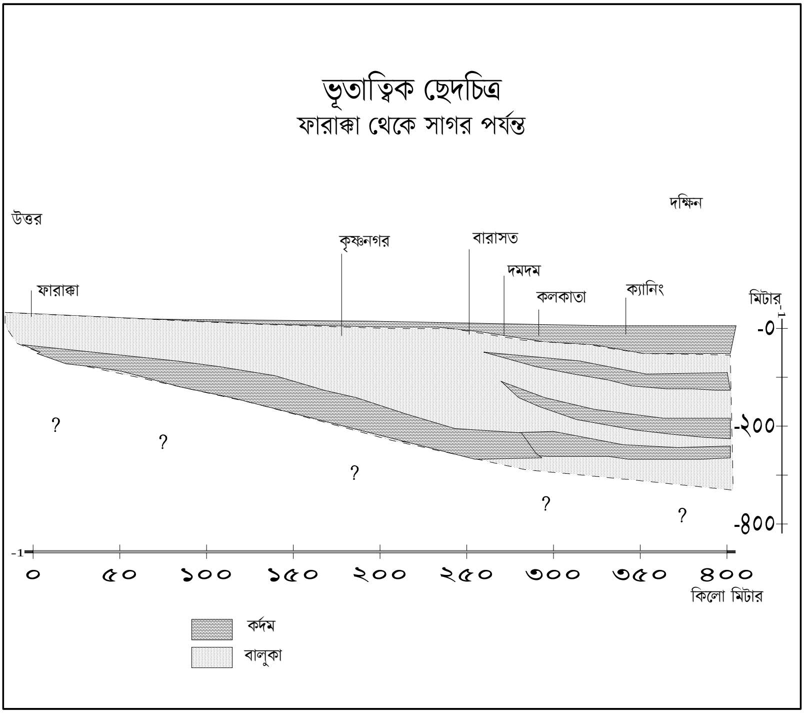
ভূতাত্ত্বিক ছেদচিত্র
ফারাক্কা থেকে সাগর পর্যন্ত
উত্তর
দক্ষিন
ফারাক্কা
কৃষ্ণনগর
বারাসত
দমদম
কলকাতা
ক্যানিং
মিটার
-০
-২০০
-৪০০
?
০
৫০
১০০
১৫০
২০০
২৫০
৩০০
৩৫০
৪০০
কিলো মিটার
কর্দম
বালুকা

ভূস্তরে.ব ছেদচিত্র।

আর্সেনিক ঠিক কোথা হতে ভূত্বকে.ব পলিতে এসে জমা হল তা নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু যে মতটা মোটামুটি ভাবে অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন তা হল গঙ্গা নদীর উৎসে বিশেষত: হিমালয়ে যে প্রস্তরের স্তর আছে তাতে ক্লোরাইট-বায়োটাইট ও অন্যান্য ফেরোম্যাগনেশিয়াম মণিকে বা তার রূপান্তরিত চেহারার কোনও মণিকে কিছু পরিমাণে আর্সেনিকের সালফোসল্টস পাওয়া যায়। ক্ষয়প্রাপ্ত এই সব মণিক যখন পলিবাহিত হয়ে নদীপথে ধাবিত হয় তখন আর্সেনিক বিমুক্ত হয়ে পলিমাটির মধ্যে মিশ্রিত আয়রণ-ম্যাগনেশিয়াম অক্সিহাইড্রক্সাইডের দানার চার পাশে সংলগ্ন (adsorbed) হয়ে যায়। এই পলিই পরে হলসিন বা মধ্য হলসিন যুগের বদ্বীপ অঞ্চলের অবক্ষেপের মধ্যে জমা হয়। হিমালয়ের বিভিন্ন জায়গায় এমনকি দার্জিলিং হিমালয়ে অনেক প্রস্তরের স্তরে আর্সেনিকের সালফাইড ও সালফোসল্টস পাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষয় প্রাপ্তির পরে পলির মধ্যে আর্সেনিকের পাইরাইট বা অন্যান্য লবন পাওয়া যায়না বললেই চলে। কিন্তু এই সব অঞ্চলে কর্দমের স্তরের মধ্যে যে পাইরাইট পাওয়া গেছে তার উৎস কিন্তু জৈবিক। যে সব জায়গার পলিতে জৈব বস্তুর পরিমাণ খুব বেশী সেই

সব জায়গায় এই পাইরাইট দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে আর্সেনিক পাইরাইট জলে আর্সেনিকের উৎস নয়, বরং একে আর্সেনিকের সিঙ্ক বা শোষক বলা যেতে পারে।

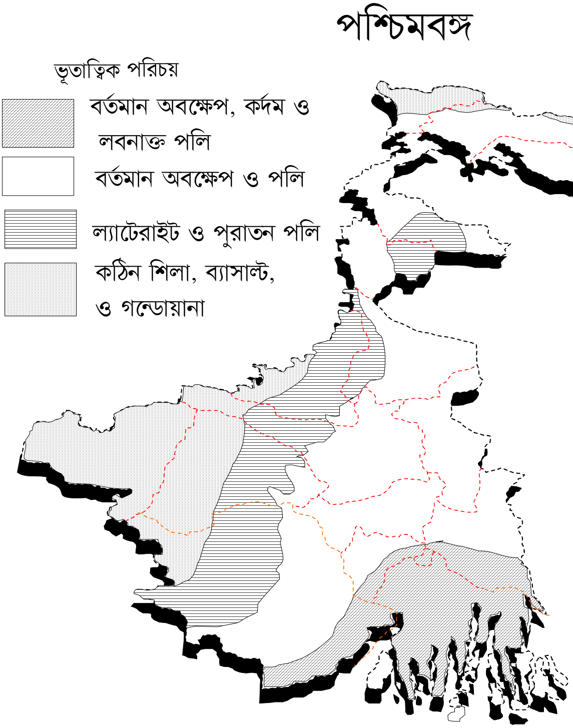
পশ্চিমবঙ্গ
ভূতাত্বিক পরিচয়
বর্তমান অবক্ষেপ, কর্দম ও লবনাক্ত পলি
বর্তমান অবক্ষেপ ও পলি
ল্যাটেরাইট ও পুরাতন পলি
কঠিন শিলা, ব্যাসাল্ট, ও গন্ডোয়ানা

চিত্র ৫ পস্চিমবঙ্গের ভূতাত্বিক চিত্র

কিন্তু এই আর্সেনিক যুক্ত পলিকণার গা থেকে আর্সেনিক কি ভাবে মুক্ত হয়ে জলে এসেছে তা নিয়ে নানা মত প্রচলিত ছিল। প্রথম মতটি ছিল ভূগর্ভ থেকে অতিরিক্ত জল উত্তোলনের ফলে ভূগর্ভের স্তরে যে ফাঁক সৃষ্টি হছে তার ফলে একটি জারক পরিবেশ তৈরী হচ্ছে। এই জারক পরিবেশে আর্সেনিকের সালফাইড জারিত হয়ে আর্সেনিকের অক্সাইড রূপে জলে আসছে। কিন্তু দেখা গেছে জারক পরিবেশে আর্সেনিক মুক্ত হলে কোনও কূপ বা পুকুরের মধ্যে আর্সেনিক সবচেয়ে বেশী পাওয়া যেত। কিন্তু তা যায়নি। আর্সেনিক জারক পরিবেশে জলে মিশ্রিত হচ্ছে এই তত্ত্ব আজকাল আর গ্রহণযোগ্য নয়।

পরবর্তী কালে আর্সেনিকের রাসায়নিক চরিত্র ভালো ভাবে অনুধাবন করে এটা জানা গেছে, আয়রণ হাইড্রক্সাইড মাখা কর্দম কণা, আয়রন-ম্যাঙ্গানিজ সাইডেরাইট, বায়োটাইট ক্লোরাইট, ইত্যাদি পলির উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন মাত্রার আর্সেনিক উপস্থিত থাকে। আয়রণ হাইড্রক্সাইডের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী পরিমাণে আর্সেনিক থাকে (১৪ থেকে ১১২ পিপিএম)। এর পরে অনুজীবদের উপস্থিতিতে একটি বিজারক পরিবেশে আর্সেনিক বিজারিত হয় এবং

জলে মিশ্রিত হয়। বর্তমানে জলে আর্সেনিক পাওয়ার পেছেনে যে তত্ত্ব আছে তার নাম জারণ-বিজারণ তত্ত্ব। এতে বলা হয়েছে আর্সেনোপাইরাটের জারণ থেকে উদ্ভুত আর্সেনিকের মিনারেল ভূগর্ভের জলে গিয়ে উপযুক্ত Eh যুক্ত পরিবেশে বিজারিত হয়ে আর্সেনিক মুক্ত করে। দেখা গেছে ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন বন্ধ করার পরও জল থেকে আর্সেনিকের পরিমাণ কমেনি। দক্ষিন বাংলাদেশে একটি ভূসলিলাধারে ভূ-রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে কার্বনের অনুপ্রবেশের সাথে আর্সেনিকের সঞ্চালন জড়িত। জলে রেডিওকার্বনচিহ্নিত নব্য মিথেনের অতিরিক্ত উপস্থিতি প্রমাণ করে যে নব্য কার্বন বর্তমানের ভূগর্ভের সলিলাধারের জৈবভূরাসায়নিক প্রক্রিয়াকে চালনা করছে। সেচের জন্য জল উত্তোলন জলের স্তরকে এমন একটা জায়গায় নামিয়ে দিচ্ছে যে সেখানে দ্রবিভূত আর্সেনিকের পরিমাণ খুব বেশী। মাটির ভেতরে মোলাস, নাইট্রেট, অর্সেনিকমুক্ত জল ঢুকিয়ে দেখা গেছে জৈব কার্বন এবং তার পচনের ফলে উদ্ভুত পদার্থগুলি খুব তাড়াতাড়ি আর্সেনিক দ্রবিভূত করতে পারে। কিন্তু জারক উপাদান জলে আর্সেনিকের পরিমাণ হ্রাস করায়।

খুব সম্প্রতি গবেষণার মাধ্যমে জলে আর্সেনিক দ্রবীভূত থাকা অথবা সলিলাধারের বালুকণার সংলগ্ন হয়ে থাকার পেছেনে যে কারণ রয়েছে তা নিয়ে কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গিয়েছে। গাঙ্গেয় সমভূমিতে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে যে পলির স্তর আছে তা বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে এর ৯০ শতাংশ কণাই কোয়ার্টজ ও ফেল্ডস্পার দিয়ে গঠিত। এবং এই কণাগুলির মধ্যে আর্সেনিক নেই। কিন্তু বাকি দশ শতাংশ ভারী মণিকের দ্বারা গঠিত যার মধ্যে বিভিন্ন ধাতুর অক্সাইড ও সিলিকেট আছে। এই মণিকগোষ্ঠির একাংশ পরীক্ষা করে দেখা যায় যে তাতে ৭ থেকে ৪০ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি আর্সেনিক আছে। এরা হল লোহার হাইড্রক্সাইড জড়ানো (coated) ম্যাগনেটাইট, ইলমেনাইট, ক্লোরাইট, ইলাইট, ও হর্ণব্লেন্ড এবং লোহার হাইড্রক্সাইড জড়ানো কোয়ার্টজের দানা। এই সমস্ত মণিকের একটা সাধারণ বিশেষত্ব হল এদের রাসায়নিক উপাদানে অথবা এদের বাইরের কোটিংএ লোহা আছে।

ভূসলিলাধারে পলির স্তর থেকে এই সব উপাদানগুলিকে আলাদা করার পর দেখা গেছে অতিক্ষুদ্র (মাইক্রণ মাপের) বর্তুলাকার বস্তু এদের গায়ে যুক্ত হয়ে আছে। এদের সংখ্যা প্রচুর এবং সাইজ বিভিন্ন। একই রকম মাপের দানার সাথে বিভিন্ন মাপেব বর্তুলাকার বস্তু পাওয়া গেছে। খুব বড় সাইজের এই বর্তুলাকার বস্তু কোনও দানার সাথে সংলগ্ন না হয় আলাদা ভাবেও উপস্থিত আছে। এই গোলাকার দানাগুলো একমাত্র সাইজেই আলাদা, বাকি সব কিছুতেই এক। আরও ভালো করে এদের পরীক্ষা করার পর দেখা গেল এই বর্তুলগুলি অতিক্ষুদ্র কেলাসিত সাইডেরাইট দানা দিয়ে গঠিত। এই সাইডেরাইট হল লোহার কার্বনেট যৌগ। এই যৌগ গঠনের জন্য লোহা পলির স্তরেই রয়েছে। জলের মধ্যে রয়েছে কার্বনেট আয়ণ।

কয়েকটি এইরকম বর্তুলাকার দানা ভাঙ্গার পর দেখা গেছে এগুলো ভেতরে ফাঁপা এবং মধ্যে অতি ক্ষুদ্র এক ধরণের ব্যাকটিরিয়া অবস্থান করছে। এই সাইডেরাইট দানার সাথে প্রচুর পরিমাণে আর্সেনিক রয়েছে। এই বর্তুলাকার দানাগুলো আসলে ঐসব ব্যাকটিরিয়ার গুটি বা ককুন যার মধ্যে তারা তাদের জীবনের কিছুটা সময় বাস করে। তাদের জীবনচক্রের মধ্যেই

তারা সাইডেরাইট দানা তৈরী করার সাথে জল থেকে আর্সেনিক সংগ্রহ করে উপযুক্ত Eh/pH পরিবেশে। এই pH এর সামান্য পরিবর্তনেই দানাগুলো গলে যেতে পারে এবং আর্সেনিক আবার জলে মিশে যেতে পারে।

আর্সেনিকের প্রাকৃতিক স্থান নির্বাচনে নদীপ্রবাহের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। নদী তার যে পলি জমা করে তার পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে নদীর ঢাল, জলপ্রবাহের গতি, ভাসমান বস্তুকণার পরিমাণ, তার আকার ইত্যাদির ওপর। সমতলে নদী যখন সর্পিল গতিপথ গ্রহণ করে তখন তার প্লাবণভূমি বিস্তৃত হয়। নদীর গতি হয়ে যায় মন্থর। নদী তার ভার আর বইতে পারে না। সে তার বাঁকে বাঁকে পলি জমা করে, যা পরে চর হয়ে জেগে ওঠে। এই চরের মধ্যে বয়ে আনা পলি জমে ওঠে। কিন্তু এই জমে ওঠা নির্ভর করে অবক্ষেপের মধ্যে কি কি ধরণের মণিক আছে তার ওপর। ভারী মণিকগুলো আগে তলিয়ে যায়। তারপর ক্ষুদ্রকণা ও হাল্কা মণিক জমা হয়। অর্থাৎ এই পলির দানার মধ্যে একটা প্রকৃতিক বাছাই হয়। নদী তার গতিপথ ছেড়ে অন্য গতিপথ নিলে পরিত্যাক্ত গতিপথের চিহ্ন সমস্ত অবক্ষেপ নিয়ে পড়ে থাকে। কালে তা আরো পলির স্তরে ঢাকা পড়ে যায়। এই রকমের বাছাই হয়ে থাকে বলে একটা স্তরের সব জায়গাতে একই রকমের দানা বা একই ধরণের মণিক থাকে না। আর্সেনিক যুক্ত মণিক বা পলির দানার মধ্যেও এই রকমের বাছাই হয়ে থাকে। সে জন্য একই সময়ের পলির স্তরে সব জায়গায় আর্সেনিক থাকতে পারেনা। ভালো করে ভূসংস্থানবিদ্যা অনুসারে অনুসন্ধান করলে প্রাচীন পরিত্যাক্ত নদীখাত গুলো চেনা যায় ও আর্সেনিক কোথায় পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনা কম তাও হয়তো বলতে পারা যায়।

আর্সেনিকের মোকাবিলা

এতক্ষণে হয়তো সবাই বুঝে গিয়েছেন আর্সেনিক অতি বিষম বস্তু। জলে, স্থলে, মাটিতে, বাতাসে এর দুর্বার উপস্থিতি। বঙ্গভূমির ভূজলে এর উপস্থিতি আমাদের শংকার বিষয়, আমাদের কাছে প্রকৃতির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা কারও একার সামর্থে সম্ভব নয়। খুব সম্পদশালী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা কেবল মাত্র একটি দেশের সরকার খুব স্বল্প পরিসরেও এর মোকাবিলা করতে পারবেনা। এর জন্য চাই দীর্ঘস্থায়ী উদ্যোগ এবং বিশ্বজোড়া সচেতনতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ। বস্তুত আর্সেনিক আজ এই বিশ্বকে একটি যুদ্ধের সম্মুখীন করে তুলেছে। এই যুদ্ধে অবশ্য ছোট বড় সবাই নেমে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য দপ্তর, বিভিন্ন দেশের সরকার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাদের সাধ্যমত এই দুটি দেশকে এবং বিশ্বের অন্যান্য আর্সেনিক আক্রান্ত দেশকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে।

আর্সেনিক নিয়ে এক দিকে যেমন গবেষণা হচ্ছে অন্যদিকে কি ভাবে আর্সেনিক মুক্ত জল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তাই নিয়ে প্রযুক্তি উদ্ভাবনেরও শেষ নেই। তবু দুটি নীতি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য, তা হল জলকে আর্সেনিক মুক্ত করে তা পানের উপযুক্ত করা অথবা পরিষ্কার জলের বিকল্প উৎস ব্যবহার করা।

আর্সেনিক পরীক্ষা

জলে আর্সেনিক আছে কি নেই জানার একমাত্র প্রত্যক্ষ উপায় হল জলের রাসায়নিক পরীক্ষা। জলে আর্সেনিক থাকলে জলের রঙ বা গন্ধের কোনও পরিবর্তন হয়না বা জলে কোনও ভাসমান কণারও সৃষ্টি হয়না। তাই সহজে বোঝা যায়না জলে আর্সেনিক আছে কি নেই। রাসায়নিক পরীক্ষা করে জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি বা পরিমাণ জানার কয়েকটি চালু পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে গুটজ্যাট পদ্ধতি সবচেয়ে চালু এবং অধিকাংশ ল্যাবরেটারীর পক্ষে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা আর্থিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য। সাধারণ রসায়নাগারে কয়েকটি সাধারণ রি-এজেন্ট দিয়ে এই পরীক্ষা চালানো যায়। এই পদ্ধতিতে জলের আর্সেনিককে জায়মান হাইড্রোজেনের উপস্থিতিতে আর্সিন গ্যাসে পরিণত করা হয়। এই আর্সিন গ্যাস উৎ পন্ন হওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে জলে কি পরিমান আর্সেনিক আছে তার ওপর। এই গ্যাস মারকিউরিক ব্রোমাইড মাখানো কাগজের ওপর দিয়ে চালনা করা হয়। এর ফলে সাদা কাগজের বর্ণ ক্রমশ: ফিকে হলুদ থেকে বাদামী তে পরিবর্তিত হয়। এই রঙ নির্ভর করে আর্সিন গ্যাসের ঘনত্বের ওপর, অর্থাৎ জলে আর্সেনিকের পরিমাণের ওপর। এই রঙ মেলানোর জন্য কলরিমিটার বা রঙের চার্ট আছে। তাই দেখে অভিজ্ঞ রসায়নবিদ বুঝতে পারেন জলে আর্সেনিকের মাত্র কত। কিন্তু এই পদ্ধতিতে খুব সূক্ষ্ম মাত্রার আর্সেনিকের পরিমাণ ধরা যায়না। এই পদ্ধতি অবলম্বন করে আর্সেনিকের ফিল্ড কিট বা মাঠে গিয়ে পরীক্ষার সরঞ্জাম তৈরী করেছে কোনও কোনও কম্পানি। এর সাহায্যে জলে আর্সেনিক আছে কি নেই তা বোঝা যায়। কিন্তু সূক্ষ্ম পরিমাণ বোঝা যায়না।

আর একটি পদ্ধতি হল উপরিউক্ত ভাবে উৎপন্ন আর্সিন গ্যাসকে সিলভার ডাই ইথাইল ডাইথায়োকার্বামেট এবং পিরিডিনের দ্রবণে শোষিত করলে দ্রবণের হলুদ রঙ ক্রমশ: চূনে হলুদ রঙে রূপান্তরীত হয়। এই রঙের ঘনত্ব স্পেক্ট্রোফোটোমিটারের মাধ্যমে মেপে জলে অতি সামান্য পরিমাণ আর্সেনিকের উপস্থিতিও বের করা যায়। ইদানিং বিভিন্ন দেশে পিরিডিনের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে বলে মরফলিন ব্যবহার করা হচ্ছে।

তবে যে পদ্ধতিতে সবচেয়ে নিঁখুত ভাবে আর্সেনিক মাপা সম্ভব তা হল এটমিক এবসরবেন্স স্পেক্ট্রোফোটোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে রাসয়নিক ভাবে আর্সেনিক হাইড্রাইড উৎপন্নের মাধ্যমে। কিন্তু এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যায়সাপেক্ষ। আজকে এই উপমহাদেশে এত বিশাল সংখ্যার নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে যে প্রতিটি কূপের জল এই এটমিক এবসরবেন্স স্পেক্ট্রোফোটোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে মাপা সম্ভব নয়। তাই প্রথমে কিট দিয়ে মাপার পরে যে কটি নলকূপে আর্সেনিক চিহ্নিত করা গেল কেবল সেই কটি কুপ থেকে জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে নিয়ে এসে পরীক্ষা করলে দূষণের সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব।

জলকে আর্সেনিক মুক্ত করা

জলে আর্সেনিক পাওয়ার পর থেকে দুই দশক পার হয়ে গিয়েছে। এতদিনে আর্সেনিক আক্রান্ত মানুষের সংখ্যাও যেমন বেড়েছে তেমনই আর্সেনিক নিয়ে মানুষের সচেতনতাও বেড়েছে। আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চলে আর্সেনিক মুক্ত জল দেওয়ার প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে গবেষণা করে নানা ধরণের পদ্ধতি বের করেছেন।আর্সেনিক মুক্ত করতে যে সব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তা নির্ভর করছে আর্সেনিকের বিভিন্ন রাসায়নিক ও ভৌত গুণেব ওপর। সব কটি পদ্ধতিরই কিছু ভালো আবার কিছু অসুবিধার দিক আছে।

আর্সেনিক দূরীকরণ পদ্ধতি বাছার প্রথম পর্যায় হল জলের রাসায়নিক পরীক্ষা। দেখা গেছে পুরোনো পদ্ধতিগুলো। যেমন- লোহার সাথে অবক্ষেপ ঘটানো, জারণ, প্রশমন ইত্যাদি প্রক্রিয়া সস্তা এবং ফলপ্রসু। অতি আধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী ফিল্টাব গুলো তুলনা মুলক ভাবে দামি। পুরোনো পদ্ধতির উপাদান সহজেই বাজারে পাওয়া যায়।

যে দুটো রাসায়নিক প্রক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তার একটি হল উজ্জীবিত এলুমিনা/ ফেরিক হাইড্রক্সাইডের প্রয়োগ এবং অন্যটি হল আয়ন বিনিময়। এই দুটি পদ্ধতি নিয়ে নানা ভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে উজ্জীবিত এলুমিনা/ ফেরিক হাইড্রক্সাইডের প্রয়োগে আর্সেনিক দূরীকরণ জলের pH এবং ব্যবহৃত উজ্জীবিতএলুমিনা/ ফেরিক হাইড্রক্সাইডের পরিমাণের ওপর নির্ভরশীল। পরীক্ষায় দেখা গেছে উজ্জীবিতএলুমিনা থেকে ফেরিক হাইড্রক্সাইড বেশী আর্সেনিক গ্রহণ করছে। আরও দেখা গেছে আর্সেনিক বিমুক্তি নির্ভর করে জলের pH ছাড়াও জলে আর্সেনিকের পরিমাণ, সালফেটের পরিমাণ ও ক্ষারতার ওপর।

আয়ন বিনিময় পদ্ধতিতে খুব শক্তিশালী ক্লোরাইড জাতীয় এনায়ন এক্সচেঞ্জ রেজিন দিয়ে আর্সেনিক দূর করা যায়। প্রশমিত pH এ আর্সেনিক (AsIII) দূর করা যয়।

উজ্জীবিতকার্বন কিছু পরিমাণে আর্সেনিক দূর করতে সক্ষম। সেটাও জলের pH এর ওপর নির্ভরশীল। pH যদি ৯.৫ এর বেস্হি হয় তবে এই পদ্ধতি কার্যকর। কিন্তু কার্বন প্রচুর পরিমাণে লাগে বলে এই পদ্ধতি খরচ সাপেক্ষ।

হিমাটাইট ব্যবহার করে ৯৬% পর্যন্ত AsIII দূর করা যায় যদি আর্সেনিকের পরিমাণ ১ মিলিগ্রাম পরিমাণ প্রতি লিটার জলে থাকে। এবং যদি pH ৭ এর কাছাকাছি থাকে। এই পদ্ধতিতে শতকরা একশো ভাগ আর্সেনিক দূর হতে পারে যদি আর্সেনিকের পরিমাণ ০.৮ মিলিগ্রাম পরিমাণ প্রতি লিটার জলে থাকে। আর্সেনিক ফিল্টাব হিসাবে ল্যাটেরাইট ব্যবহার করেও সুফল পাওয়া গিয়েছে। এই ল্যাটেরাইটকে ১৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপে ইঁট বানিয়ে তার গুঁড়ো ফিল্টাব হিসাবে ব্যবহার করে দেখা গেছে আর্সেনিক বিমুক্তি ত্বরান্বিত হয়েছে।

মেমব্রেন বা ত্বক পদ্ধতিতে একটি অর্ধপ্রবেশ্য ত্বক বা ছাঁকনি দিয়ে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থকে তাদের ভৌত ও রাসায়নিক চরিত্র অনুসারে পৃথক করা হয়। সেলুলোজ এসিটেট ও এরোম্যাটিক পলিয়ামাইডের পাতলা ফিল্ম এই ত্বক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

আরও একটি সহজ পদ্ধতি হচ্ছে লোহার অক্সাইডের সাথে আর্সেনিকের সহ অবক্ষেপ ঘটানো। এর জন্য জৈব প্রযুক্তি ও ব্যাকটিরিয়ার সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন।

জল থেকে আর্সেনিক মুক্ত করার যে সব পদ্ধতি চালু আছে তাদের নিয়ে নীচের সারণীতে আলোচনা করা হল।

পদ্ধতি	**সুবিধা**	**অসুবিধা**
১) সহঅবক্ষেপ	চালু পদ্ধতি চালানো সস্তা, সহজলভ্য বসানোর খরচ কম	গাদ নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ দরকার অনেক রাসায়নিক ধাপ আছে
২) ফটকিরি দিয়ে সংযুক্তি	সহজলভ্য বস্তু	প্রিঅক্সিডেশন অবশ্য কর্তব্য
৩) লৌহ দ্বারা সংযুক্তি	ফটকিরি থেকে বেশী কার্যকারী	AsIII কম পরিমাণে দূর হয়
৪) চূন দিয়ে	সজলভ্য রাসায়নিক বস্তু	অনেকগুলো রাসায়নিক কারণেব ওপর কার্যকারিতা নির্ভর করে
৫) উজ্জিবিত এলুমিনা	সহজেই পাওয়া যায়	জলের pH অনুকুলে থাকা প্রয়োজন
৬) লৌহ সংযুক্ত বালুকা	আশা করা যয় এটা সস্তা পরিশ্রুত করণ জরুরি নয়	মান নির্ণয় করা হয়নি বর্জ্য্য পদার্থটি বিষাক্ত
৭) শোষণ পদ্ধতি	দৈনিক গাদ উৎপন্ন হয়না	পদ্ধতি কার্যকারিতা নিয়মিত দেখা দরকার মাধ্যম পরিবর্তন করা দরকার

৮) আয়ন বিনিময়	খুবই প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি	অত্যন্ত দামি
		রক্ষণাবেক্ষণের খরচ খুবই বেশী
		গাদ নিয়ে সমস্যা
৯) মেমব্রেন পদ্ধতি	নির্ভরযোগ্য কার্যকারিতা	পরিচালনার খরচ খুব বেশী
	আর্সেনিক দূর করার ক্ষমতা বেশী	প্রচুর মূলধন দরকার
	কোনও কঠিন বর্জ্য নেই	চালানোর খরচ বেশী
	কম জায়গা দরকার	বিষাক্ত বর্জ্য জল উৎপন্ন হয়
	অন্য বস্তুও জল থেকে দূর করতে পারে	জলের রাসায়নিক অবস্থার ওপর কার্যকারিতা নির্ভর করে

শোধণ

বাংলাদেশে নোয়াখালি জেলায় ডানিডা বলে একটি সংগঠন ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে ফিটকিরি ও পটাশিয়াম পার্ম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করে বাড়িতে ব্যবহারের উপযুক্ত আর্সেনিক ফিল্টার তৈরী করেছেন। এতে একটা বালতিতে এই রাসায়নিক জলের সাথে মেশাতে হয় এবং এক থেকে দেড় ঘন্টা পরে সেই মিশ্রণ কে ছেঁকে পরিশ্রুত জল অন্য একটি বালতিতে সংগ্রহ করা হয়। এর দাম পড়ে মাসে দশ টাকা। এর ফলে ১.১ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার পরিমাণ আর্সেনিক জলে থাকললে তা কমে ০.০১৬ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায়। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ডানিডা একটি দুই পাত্র সমন্বিত একটি ফিল্টার তৈরি করেছেন যার দাম পড়ে তিনশ টাকা। এটা বাংলাদেশের জলের মান অনুযায়ী কাজ করতে পারে।

চট্টগ্রামের কাছে মাদারীপুরে জলের মধ্যে দ্রবীভূত লোহার সাথে আর্সেনিকের সহ অবক্ষেপ ঘটিয়ে জলকে আর্সেনিক মুক্ত করার কাজ করছেন ওয়াটার এইড বলে একটি সংস্থা। তবে জলে লোহার পরিমাণ কম থাকলে বা জলের মধ্যে লবনের ভাগ বেশী থাকলে এই পদ্ধতির কর্যকারিতা কমে যায় বলে তাঁরা লক্ষ্য করেছেন।

WHO PAHO - Pan American Center for Sanitary Engineering and Environmental Sciences (CEPIS) পেরু তে এলুফ্লোক বলে একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। এটা আর্জেন্টিনাতে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এতে একটা ছোট্ট থলির মধ্যে কিছু রাসায়নিক পদার্থ থাকে তা আর্সেনিক দূষিত জল ভরা একটি বালতিতে এক ঘন্টা ডুবিয়ে রাখতে হয়। এক ঘন্টা পরে ওই জল পানের উপযুক্ত হয়ে যায়।তবে এটা ১.১ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার পরিমাণ আর্সেনিক যুক্ত জল কে নিরাপদ জলে পরিণত করতে পারে। তবে এক বালতি জল পরিশ্রুত করণের খরচ প্রায় সাত টাকা পড়ে। বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গের মতা আর্থ সামাজিক অবস্থায়

এই পদ্ধতির খরচ খুবই বেশী। একমাত্র কোনও অনুদান বা বাইরের আর্থিক সাহায্য ছাড়া এই পদ্ধতি ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

আর্সেনিকের ফিল্টারের বর্জ্য

ফিল্টারের সাহায্যে জলকে আর্সেনিক মুক্ত করলেও পেছনে পড়ে থাকে আর্সেনি যুক্ত বর্জ্য বা গাদ। এই বস্তুটিকে সঠিক উপায়ে নিষ্ক্রিয় না করলে তা পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। এই বর্জ্যের আর্সেনিকের সঠিক ঠিকানা তৈরী না করলে তা আবার পরিবেশে ফিরে এসে পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলতে পারে। এই গাদকে দূর করার জন্য নানা উপায় ভাবা হয়েছে।

১) সোক পীট তৈরী করে সেখানে মাটির নীচে একে চাপা দেওয়া। এটাখুব সহজ হলেও মাটির নীচে এর থেকে আর্সেনিক মুক্ত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। মাটির এবং মিশ্রিত জলের Eh/ pH এর পরিবর্তন এই দূর্ঘটনা ঘটাতে পারে।

২) আর্সেনিকের গাদ লোকালয় থেকে বহু দূরে নিয়ে তাকে অন্যান্য বর্জের সাথে জমিতে ফেলে দেওয়া। কিন্তু এই পদ্ধতি সাময়িক সুফল দিলেও জলস্রোতের সাথে সেই আর্সেনিক গাদ জলাশয়ে বা নদীতে চলে যেতে পারে, অথবা ভূগর্ভে সঞ্চিত হতে পারে।

৩) সিমেন্টের সাথে এই গাদ মিশিয়ে কংক্রিটের ব্লক বানিয়ে রেখে দেওয়া। এই পদ্ধতিতে বেশ কিছুকাল আর্সেনিক বাইরে আসতে পারবেনা। কিন্তু এই কংক্রিট ব্লকেরও একটা আয়ু আছে। তার পর এর আবহবিকার ঘটতে পারে এবং এর থেকে আবার আর্সেনিক বের হতে পারে।

৪) আর্সেনিকের গাদকে ৯০০ থেকে ১২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে উদ্বায়ী আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড ও আর্সেনিক পেন্টক্সাইড তৈরী হয়। এই উদ্বায়ী আর্সেনিক যৌগ বাতাসে মিশে গিয়ে দূরে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ পদ্ধতি বাতাসকে দূষিত করতে পারে এবং বৃষ্টির সাথে এই আর্সেনিক পুনরায় পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে।

এই সব পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে আরও দুটি পদ্ধতি ভাবা হয়েছে। একটি হল এই গাদ থেকে আর্সেনিক ধাতু নিষ্কাশণ করা। ধাতু হিসাবে নিষ্কাশিত আর্সেনিক পরিমাণে খুব কম। একে সহজেই সিল করা আধারে রেখে দেওয়া যায়। আর একটি পদ্ধতি হল অক্সিজেন মিশ্রিত জল মাটির ভেতরে প্রবেশ করিয়ে সেখানে ব্যাকটিরিয়ার বৃদ্ধি ঘটিয়ে আর্সেনিককে মাটির নীচেই জল থেকে কঠিন যৌগ হিসাবে আলাদা করে মাটির নীচেই রেখে দেওয়া। ভাবা হয়েছে যে সব নলকূপের থেকে আর্সেনিক যুক্ত জল উঠছে তার পাশে আর একটা গর্ত দিয়ে অক্সিজেন মিশ্রিত জল প্রবেশ করানো। এই পদ্ধতি এখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

আর্সেনিক টেকনোলজি পার্ক

জল থেকে আর্সেনিক দূরীকরণের জন্য বহু সংস্থা নানা ধরণের ফিল্টার ও পদ্ধতির কথা বলেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি বাণিজ্যিক সংস্থা তাদের তৈরী আর্সেনিক ফিল্টার নিয়ে বাজারে এসেছেন। কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাও তাদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে আর্সেনিক

দূরীকরণের কাজ করে চলেছেন। কয়েক বছর আগে বারুইপুরে স্কুল অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, অল ইন্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অফ হাইজিন এন্ড পাবলিক হেল্থ এর যুগ্ম প্রচেষ্টায় এবং কানাডা সরকারের অর্থে এই সব ফিল্টারের তুলনামূলক কার্যকারিতা দেখার জন্য একটি আর্সেনিক টেকনোলজিকাল পার্ক নির্মিত হয়েছে। সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে।

এই টেকনোলজি পার্কের উদ্দেশ্য হল প্রতিটি বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক সংস্থার তৈরী বিভিন্ন ফিল্টার কি ধরণের সলিলভূতাত্ত্বিক পরিবেশে এবং কি পরিমাণ আর্সেনিক যুক্ত জলকে কি পরিমাণে পরিশ্রুত করতে পারে এবং যে সব অঞ্চলে এই ফিল্টারগুলো বসানো হয়েছে তার অর্থনৈতিক মান বিবেচনা করা। এ জন্য প্রতি সপ্তাহে প্রতিটি ফিল্টার থেকে উৎস জল এবং পরিশ্রুত জল পরীক্ষাগারে পরীক্ষা করে দেখা হয়। জনগণের মধ্যে থেকে আর্সেনিক জনিত ভয় দূর করা এবং সচেতনতা প্রসার করাও এর উদ্দেশ্য। এ ছাড়া এটাও দেখা দরকার জনগণ কি ভাবে এই ফিল্টারগুলোকে তাদের জীবন যাত্রায় গ্রহণ করছে এবং এদের পরিচর্যা রক্ষণাবেক্ষণে জনগণ কতটা সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করছে। যে সব সংস্থা এই টেকনোলজি পার্কে তাদের ফিল্টার নিয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের নাম হল:

১) আর পি এম মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড, নতুন দিল্লী, ২) ওয়াটার সিস্টেমস ইন্টারন্যাশনাল, ইউ এস এ, ৩)পল ট্রখনার প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৪) অক্সাইড ইনডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, দুর্গাপুর, বি ই কলেজ মডেল ৫)আটিয়াকন, কলকাতা ৬) অল ইন্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অফ হাইজিন এন্ড পাবলিক হেল্থ, কলকাতা ৭) আয়োনোকেম, কলকাতা ৮) এপিরণ টেকনোলজিস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ৯) স্কুল অফ ফান্ডামেন্টল রিসার্চ, কলকাতা ১০) রাজ্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নীচের সারণীতে এই সব সংস্থার তৈরী আর্সেনিক ফিল্টারের সম্বন্ধে জানানো হল।

সারণী ঃ ৫ বিভিন্ন ফিল্টারের কার্যকারিতা

সংস্থার নাম		মাধ্যম
আর পি এম মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড, নতুন দিল্লী, আলকান কেমিকালের প্রতিনিধি	আডসরব্যান্ট	উজ্জীবিত এলুমিনা AAFS-50 (পেটেন্টেড)
ওয়াটার-সিস্টেমস ইন্টারন্যাশনাল, ইউ এস এ,	আয়ন বিনিময়	রেজিনের পাত্র, নানা মেটাল অক্সাইডের সমাহার (পেটেন্টেড)
পল ট্রখনার প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা	আডসরব্যান্ট	AdsorpAs (পেটেন্টেড)
অক্সাইড ইনডিয়া প্রা:লি, দুর্গাপুর, বি ই কলেজ মডেল	আডসরব্যান্ট	উজ্জীবিত এলুমিনা AS-37(পেটেন্টেড)

আটিয়াকন, কলকাতা	অনুঘটক, অবক্ষেপ ইলেক্ট্রন বিনিময়	AFDWS-2000
অলইন্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অফ হাইজিন এন্ড পাবলিক হেল্থ, কলকাতা	জারণ জমা হওয়া ফিল্ট্রেশন	ক্লোরিনেটিং এজেন্ট ও ফেরিক এলাম
আয়োনোকেম, কলকাতা	আয়ন বিনিময়	ফেরিক হাইড্রক্সাইড
এপিরণ টেকনোলজিস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড	আডসরব্যান্ট	একুয়াবাইন্ড (পেটেন্টেড) উজ্জীবিত এলুমিনা ও নানা মেটাল অক্সাইডের সমাহার
স্কুল অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, কলকাতা	আডসরব্যান্ট	এলুমিনিয়াম সিলিকেট ও ফেরিক হাইড্রক্সাইড
রাজ্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	আডসরপশন	লাল হেমাটাইট, কোয়ার্টর্জ ও বালুর সাথে উজ্জীবিত এলুমিনা

সারণী ৬: বিভিন্ন ফিল্টারের ক্ষমতা , বসানো এবং প্রতিবার ফিল্টার বদলানোর খরচ

সংস্থার নাম	ক্ষমতাএবংআর্সেনিকের পরিমাণ	আনুমানিক দাম
আর পি এম মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড, নতুন দিল্লী,	বছরে দুই লক্ষ লিটার যদি জলে আর্সেনিকের পরিমাণ হয় ০.৫ পিপিএম	৪৪,৩০০ টাকা, বদলানোর খরচ ২০,০০০ টাকা
ওয়াটার-সিস্টেমস ইন্টারন্যাশনাল, ইউ এস এ,	তিন লক্ষ লিটার ,আর্সেনিক. ১.০ পিপিএম	৯২,৩০০ টাকা, বদলানোর খরচ ৪০,০০০ টাকা
পল ট্রখনার প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা	নয় লক্ষ লিটার ক্ষমতা যদি আর্সেনিক. হয় ১.০ পিপিএম	৭৫,০০০ টাকা, বদলানোর খরচ ২৫,০০০ টাকা
অক্সাইড ইন্ডিয়া প্রা:লি, দুর্গাপুর, বি ই কলেজ মডেল	ঘন্টায় ৬০০ লিটার ক্ষমতা আর্সেনিক.০.৫ পিপিএম, দু বছর	৪৭,০০০ টাকা, বদলানোর খরচ ১৫,০০০ টাকা

আটিয়াকন, কলকাতা	১০, ০০০ লিটার ক্ষমতা আর্সেনিক ১.০ পিপিএম, মাঝে মাঝে ব্যাক ওয়াস করার দরকার	৭৫,০০০ টাকা,
অলইন্ডিয়া ইন্স্টিটিউট অফ হাইজিন এন্ড পাবলিক হেল্থ, কলকাতা	ঘন্টায় ১০০০ লিটার ক্ষমতা, মাঝে মাঝে গাদ পরিষ্কার করার দরকার	৩৫,০০০ টাকা, ও রাসায়নিকের খরচ
আয়োনোকেম, কলকাতা	ঘন্টায় ৬০০ লিটার ক্ষমতা আর্সেনিক. ০.৫ পিপিএম , মোট ক্ষমতা ১,৪০,০০০ লিটার	৩৯,০০০ টাকা,
এপিরণ টেকনোলজিস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড	দিনে ১০০০ লিটার আর্সেনিক. ১ পিপিএম, ৬ থেকে ৮ মাস পর পর বদলাতে হয়	৮০,০০০ টাকা, বদলানোর খরচ ১৫,০০০ টাকা
স্কুল অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, কলকাতা	ঘন্টায় ৬০০ থেকে ১০০০ লিটার মাঝে মাঝেই গাদ এবং ফিল্টার পরিষ্কার করার দরকার	৮,০০০ টাকা, বদলানোর খরচ ১২০০ টাকা
রাজ্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	ঘন্টায় ৬০০ থেকে ১০০০ লিটার ক্ষমতা। গাদ এবং ফিল্টার পরিষ্কার করার দরকার	২৭,০০০ টাকা,

আজ প্রায় কয়েক কোটি মানুষ আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চলে বাস করছেন। এতদিন পর্যন্ত এদের একমাত্র পানীয় জলের উৎস ছিল নলকূপ। কিন্তু অর্সেনিক দেখা দেওয়ায় এই সব অঞ্চলের মানুষেরা বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। আজ এটাকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘস্থায়ী প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কিন্তু এর মোকাবিলাও করতে হবে সঠিক রাস্তায় এবং সঠিক পদ্ধতিতে। আর্সেনিকের মোকাবিলায় যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা কয়েকটি ধাপে বিভক্ত। ১) সমীক্ষা ২) রোগী চিহ্নিতকরণ ও চিকিৎসা ৩) বিকল্প ব্যবস্থা।

সমীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য আর্সেনিক আক্রান্ত দেশগুলিতে এই প্রতিটি ধাপেই কাজ অনেকটা এগিয়েছে। বিশেষ করে সমীক্ষার কাজে প্রচুর অগ্রগতি হয়েছে। এই সমীক্ষার প্রথম ধাপ হল আর্সেনিক এলাকায় এবং অনুরূপ ভূতত্ত্ব রয়েছে এই সমস্ত এলাকার নলকূপগুলির জলের নমুনার রাসায়নিক পরীক্ষা। রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য উন্নতমানের পরীক্ষাগার এবং যন্ত্র দরকার। মাঠ থেকে জলের নমুনা রসায়নাগারে নিয়ে আসতে হয়। এই কাজটি অত্যন্ত সময় এবং অর্থ সাপেক্ষ। এর বিকল্প হিসাবে আর্সেনিক টেস্ট কিট বলে একটি ছোট সরঞ্জাম বেরিয়েছে। তা দিয়ে জলে আর্সেনিক আছে কি নেই সেই পরীক্ষা মাঠে বসেই

করা সম্ভব। আর্সেনিক পাওয়া গেলে তখন সেই জলের নমুনা রসায়নাগারে এনে তার প্রকৃত পরিমাণ জেনে নেওয়া যায়।

পরবর্তী ধাপে প্রয়োজন আর্সেনিকের রুগী চিহ্নিতকরণ। গ্রামের মধ্যে ঘুরে ঘুরে এই সব রুগীদের খুঁজে বের করে তাদের রোগ কতটা ছড়িয়েছে তা নির্ণয় করা দরকার। এর জন্য ডাক্তার ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করতে হয়। এই সব রুগীদের আর্থ সামাজিক অবস্থাও জানা দরকার। এর ওপর নির্ভর করেই কি ধরণের বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার তা ঠিক করা হবে।

সমীক্ষার পরবর্তী ধাপ হল সলিলভূতাত্বিক সমীক্ষা। এই সমীক্ষার মাধ্যমে আর্সেনিক এলাকার ভূতত্ব এবং আর্সেনিক যুক্ত ভূসলিলাধারের ভূতত্ব জানা দরকার। এটাও জানা দরকার বিভিন্ন স্থানের এবং বিভিন্ন গভীরতার ভূসলিলাধারের মধ্যে কোনও সংযোগ আছে কিণা। তা ছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে জলপৃষ্ঠের গভীরতার কতটা তারতম্য হচ্ছে তা সমীক্ষা করা দরকার। ভূগর্ভস্থ জলের গতি কোন দিকে, সেই এলাকার জল পরবর্তী সময়ে অন্য কোনও এলাকার ভূসলিলাধারে প্রবেশ করে কিণা এই তথ্যও সমীক্ষার মাধ্যমে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। এই সমীক্ষার জন্য দক্ষ ভূতাত্বিকের প্রয়োজন। যাঁর স্থানীয় ভূতত্ব সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান আছে এবং ভূতাত্বিক ইতিহাস বুঝতে পারেন তিনিই এই কাজ সবচেয়ে ভালো করতে পারবেন।

সমীক্ষার পরবর্তী ধাপ হল মানচিত্র গঠন এবং একটি ভৌগোলিক তথ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা। সমীক্ষার মাধ্যমে যে উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে তা নিয়ে একটি উপাত্ত ব্যাঙ্ক (databank) গড়ে তোলা দরকার। ভূতাত্বিক এবং সলিল ভূতাত্বিক সমীক্ষার মাধ্যমে যে সব তথ্য পাওয়া গিয়েছে তা দিয়ে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক ভূতাত্বিক ও সলিলভূতাত্বিক মানচিত্র গড়ে তোলা দরকার। সেই মানচিত্রের ওপর সমস্ত নমুনা নলকূপের স্থান নির্দিষ্ট করা হবে। এই সব উপাত্ত দিয়ে যে সব মানচিত্র তৈরী করতে হবে তা হল:-

১) ভূতাত্বিক এবং সলিলভূতাত্বিক মানচিত্র। এই মানচিত্রে দেখানো থাকে ভূপৃষ্ঠে কোন যায়গায় কি রকম ভূতাত্বিক বস্তু অর্থাৎ কি ধরণের শিলাস্তর বা পলির স্তর রয়েছে এবং তার নতি কোন দিকে। এই মানচিত্র থেকে ভূগর্ভের কোনদিকে বা কত দূর পর্যন্ত শিলাস্তরটি বা পলির স্তরটি বিস্তৃত তা সহজেই অনুমান করা যায়। এ ছাড়া সেই শিলা বা পলিস্তরের সান্দ্রতা, জল ধারণ ক্ষমতা জল প্রবহনের ক্ষমতা, কোনও কূপ স্থাপন করলে তার জলদান ক্ষমতা ইত্যাদি তথ্য নির্দিষ্ট চিহ্ন এমং মান দিয়ে দেখানো থাকে।

২) নমুনা কূপের স্থান নির্দিষ্ট মানচিত্র:- এই মানচিত্রে বিভিন্ন ধরণের কূপ যার ওপর সমীক্ষা করা হয়েছে তা দেখানো থাকে।

৩) ভূগর্ভ জলের গভীরতা চিহ্নিত মানচিত্র: এই মানচিত্র অনেকটা কন্ট্যুর মানচিত্রের মত। কিন্তু এখানে যে কন্ট্যুর বা সমমানরেখা থাকে তা দিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে কত গভীরতায় ভূগর্ভের জলের উপরি তলটি অবস্থান করছে তা বোঝা যায়। বছরের বিভিন্ন সময়ের এই মানচিত্র এলাকার জলের লেয়ার সম্পর্কে তথ্য দান করে।

৪) ভূগর্ভের ভূতাত্বিক ছেদ চিত্র: এটা ভূগর্ভের ভূতত্ত্ব বুঝতে সাহায্য করে। এর থেকে বোঝা যায় একটি ভূসলিলাধার কত গভীরতায় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূগর্ভে কটি একুইফার বা ভূসলিলাধার রয়েছে বা কোন সলিলাধাররের সাথে কোনটির যোগ রয়েছে তাও বোঝা যায়।

৫) জলের রাসায়নিক মানের মানচিত্র: এটাও কন্ট্যুর চিত্রের মত সমমান রেখা দিয়ে তৈরী। এখানে রেখাগুলি কোনও একটি বস্তু যেমন জলের আর্সেনিক বা লোহার পরিমাণ কোথায় কত তা বুঝতে সাহায্য করে।

এ ছাড়াও এই বিষয়ে আরও নানা ধরণের মানচিত্র যেমন আর্থ সামাজিক, জমির ব্যবহার, সেচ সেবিত জমির এলাকা ইত্যাদি তৈরী করা যায় যা পরবর্তীকালে পরিকল্পনাকারীদের সাহাযা করবে।

এই সবকটি মানচিত্র এবং নানা ধরণের উপাত্ত কমপিউটার চালিত ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে বিশ্লেষণ করলে কোথায় জলের দূষণ কত, কোথায় কত লোক এই দূষণের শিকার হয়েছেন বা কোথায় কোন নলকূপ কত গভীরতার থেকে জল উত্তোলন করছে এবং সেই জলের রাসায়নিক মান বা দূষণের পরিমাণ কত এই সব তথ্য খুব সহজেই হাতের মুঠোর মধ্যে চলে আসবে। পরে এর থেকে আর্সেনিক মুক্ত ভূসলিলাধারকে চিহ্নিত করা যাবে, এবং সেই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে যার দ্বারা কোথায় কত লোককে চিকিৎসা বা পুনর্বাসন দেওয়া যাবে ও তার আর্থিক দায়ভার কত হিসাব করা যাবে।

ভূপদার্থ সমীক্ষা

ভূগর্ভের জলের অবস্থান, চলন ও প্রবাহের প্রকৃতি জানার জন্য ভূপদার্থ সমীক্ষা খুবই জরুরী। এই আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চলে বিভিন্ন আণবিক বিকিরণ তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে সমীক্ষা করে অনেক তথ্য পাওয়া যায় যা ভূগর্ভের অভ্যন্তরে জলের চলন, ভূসলিলাধারটির বয়স, এবং বর্তমানে সেই জলে ভূপৃষ্ঠ হতে অনুপ্রবেশ বা পুষ্টি হচ্ছে কিনা তা জানা যায়। কিছুকাল আগে পশ্চিমবঙ্গে যে এই ধরণের সমীক্ষা হয়েছিল তা থেকে জানা গিয়েছে মুর্শিদাবাদ জেলায় ১০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত জলে ইদানিং কালেই বর্ষার জলের অনুপ্রবেশ ঘটে। কোথাও কোথাও নদী থেকে জল অনুপ্রবেশ করে। খুব গভীর ভূসলিলাধারের জলও ৫০০ বছরের বেশী প্রাচীন নয়। গভীর ও অগভীর ভূসলিলাধারের মধ্যে কোথাও কোথাও যোগ রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগণায় গভীর ভূসলিলাধারে জলের বয়স ৫০০০ থেকে ১৩০০০ বছর। অগভীর সলিলাধারে বর্তমান কাল ও প্রাচীন কালের জল মিশ্রিত আছে। এই সব তথ্য ভূসলিলাধারে আর্সেনিকের অবস্থান ও তার উৎপত্তি নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে ভূবৈজ্ঞানিকদের সাহায্য করছে।

চিকিৎসা

আর্সেনিক জনিত উপসর্গগুলি হল একটি অতি ধীর বিষক্রিয়ার ফল। এই বিষক্রিয়া এত ধীর যে বিষক্রিয়ার ফল শরীরে প্রকাশ পেতে কয়েক মাস বা কয়েক বছর পার হয়ে যায়। যখন দেহে উপসর্গ গুলি প্রকাশ পায় তত দিনে রোগ অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। তাই এর চিকিৎসা শুধু কঠিন তাই নয় দীর্ঘস্থায়ীও বটে। তবে আর্সেনিকোসিসের রুগীর সন্ধান পাওয়া

গেলে প্রথমেই দেখতে হবে সে যেন আর্সেনিক মুক্ত জল পায়। আর্সেনিক মুক্ত জল ব্যবহারই চিকিৎসার প্রথম ধাপ। এর পর চিকিৎসকের পরামর্শ মত চিকিৎসা করাতে হবে।

বিকল্প উৎস

ভূজল থেকে আর্সেনিক দূর করার বহু পদ্ধতি রয়েছে। অনেক কম্পানি আবার এই সব পদ্ধতিতে ফিল্টার তৈরী করে ব্যবসা করছে। কিন্তু এই সব ফিল্টার শুধু যে দামি তা নয় এগুলো থেকে যে বর্জ্য উৎপন্ন হচ্ছে তা নিয়েও পরিবেশগত সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এগুলোকে দূর করা এবং নিয়মিত ভাবে ফিল্টারগুলোকে বদলানো ও রক্ষণাবেক্ষণ করাও অসুবিধা জনক। অনেক ক্ষেত্রেই স্থানীয় মানুষের কাছে এগুলো পৌঁছে দিতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। ভারত ও বাংলাদেশের মানুষেরা কোনও কোনও জায়গায় এগুলোকে গ্রহণ করলেও সব জায়গায় পয়সার অভাবে তা বসানো সম্ভব হয়নি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কোথাও কোথাও সেগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে। তা ছাড়া ভারত ও বাংলাদেশের মত জলসম্পদ সম্পন্ন দেশে শুধু মাত্র ভূগর্ভের জলের ওপর নির্ভর করতে হবে এমন কথা ভাবা উচিত নয়। বরং বিকল্প কোনও ব্যাবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা তাও দেখা দরকার। এই কারণে অনেকগুলো বিকল্প পদ্ধতি ভাবা হয়েছে। তাই নিয়ে কিছু আলোকপাত করা হল।

পুকুরের জল

মাত্র তিন দশক আগে জীবানু দূষণ ও স্বাস্থ্যের কারণে আমাদের দেশের মানুষেরা পুকুরের জল বর্জণ করে নলকূপের জলকে বেছে নিয়েছিলেন দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য। এর ফলে এই দুই বাংলার অজস্র পুকুর, নদী, খালের প্রতি মানুষের আগ্রহ হারিয়ে যেতে থাকল। আগেকার গ্রামের পানীয় জলের দীঘি গুলো এখন অনেক গুলোই মজা পুকুরের রূপ নিয়েছে। সেগুলোতে মাছের চাষ ছাড়া আর কোনও কিছুই হয়না। কিন্তু নিশ্চিত ভাবে বলা যায় এই সব পুকুর আর্সেনিক মুক্ত। এর জল উপযুক্ত ভাবে শোধণ করে নিলে তা পানের যোগ্য এবং এর জল থেকে কোনও দূষণ হওয়ার ভয় নেই।

কিন্তু তার জন্য কিছু প্রযুক্তিগত চিন্তা এবং সামাজিক সচেতনতার প্রয়োজন। অল ইন্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অফ হাইজিন এন্ড পাবলিক হেল্থ বেশ কিছুকাল আগেই এই ধরণের একটি পদ্ধতির মডেল বানিয়েছিলেন। এই মডেল হুগলির কোনও কোনও গ্রামে বসিয়ে সুফল পাওয়া গিয়েছিলো। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী এবং বিস্তৃত প্রচারের অভাবে সেই মডেল খুব জনপ্রিয় হয়নি এখনও। এই পদ্ধতিতে গ্রামের একটি পুকুরকে পানীয় জলের পুকুর হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে। সেই পুকুরে স্নান, বাসন মাজা, গরু মোষ ধোয়ানো বন্ধ রাখতে হবে। পুকুরের চার পাশ উঁচু করে দিতে হবে যাতে বাইরের কোনও দূষিত জল সেখানে প্রবেশ না করতে পারে। এবার এই পুকুরের থেকে জল তোলার জন্য একটি হ্যান্ডপাম্প থাকবে। সেই পাম্প দিয়ে তুলে একটা লম্বা চৌবাচ্চায় সেই জল ফেলতে হবে। এই চৌবাচ্চাটি হচ্ছে একটি বালু ও উপল দিয়ে ভর্তি কয়েকটি প্রকাষ্ঠ যার মধ্যে দিয়ে জল বয়ে গিয়ে আর একটি ছোট চৌবাচ্চায় জমা হবে। বালু ও

উপলের স্তর দিয়ে যাওয়ার সময় জল পরিশ্রুত হয়ে শেষ চৌবাচ্চায় জমা হলে সেখানে জলে ক্লোরিন মেশানোর ব্যবস্থা থাকবে যাতে জল জীবানু মুক্ত হয়। এই জল পানের যোগ্য এবং সহজেই পাওয়া যায়।

এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এটা একবার বসানো হলে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কোনও খরচ নেই। ক্লোরিনের খরচ সামান্য। গ্রামের কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এটার দেখাশোনা করতে পারবে। কিন্তু এই পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করতে সচেতনতার দরকার। কারণ নলকূপের জল উত্তোলন সহজ বলে মানুষ চট করে কোনও বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করতে আগ্রহ দেখায় না।

নীচের চিত্রে এই রকমের একটি মডেল দেখানো হল।

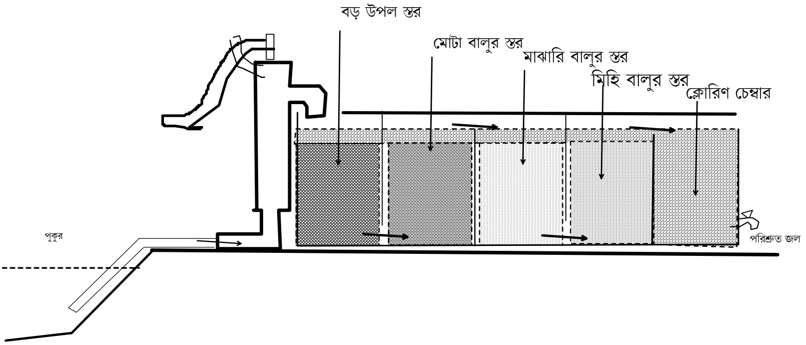

পুকুরের জল শোধণ প্রক্রিয়া

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ

পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে গড়ে দেড়হাজার মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। উত্তরবঙ্গে এর পরিমাণ প্রায় তিন হাজার মিলিমিটার। এই বিপুল পরিমাণ জল কিছুটা ভূগর্ভে প্রবেশ করে, কিছুটা বাতাসে ফিরে যায় আর বাকিটা বয়ে চলে যায় সমুদ্রে। এই বিপুল পরিমাণ জল প্রকৃতপক্ষে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজে একেবারেই ব্যবহার করিনা। কিন্তু এই বৃষ্টির জল পারিষ্কার। জলে আর্সেনিক বা অন্য কোনও দূষিতবস্তুর পরিমাণ এত কম যে তা দীর্ঘকালেও কোনও দূষণ জনিত স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করবেনা। আর্সেনিকের মোকাবিলায় এই জলকে ব্যবহার করার কথা ভাবা দরকার।

আমাদের দেশে উত্তরাঞ্চলে পাহাড়ি এলাকায় বাড়ির ছাদের জলকে গৃহস্থালির কাজে ব্যবহার করার চল বহু কালের। তারা এই জলকে পানও করে থাকে। আর্সেনিক দূষিত এলাকায় ছাদের ওপর ঝরে পড়া বৃষ্টির জলকে শোধন করে পান ও রান্নার কাজে ব্যবহার করা চলে। এই জলে দ্রবীভূত বস্তুর পরিমাণ এত কম যে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। দু এক পশলা বৃষ্টির পরে জলে ভাসমান বস্তুকণাও থাকেনা বললেই চলে। পান করার জন্য এই জলকে শুধুমাত্র জীবানুমুক্ত করা দরকার। এই জল সরাসরি ব্যবহার করা যায় অথবা বাড়ির

নীচে কিম্বা ছাদের ওপরে ট্যাঙ্ক বানিয়ে ধরে রাখা চলে। নীচে এই ধরণের একটি ব্যবস্থা দেখানো হল।

গভীর নলকূপের সাহায্যে জলোত্তলন

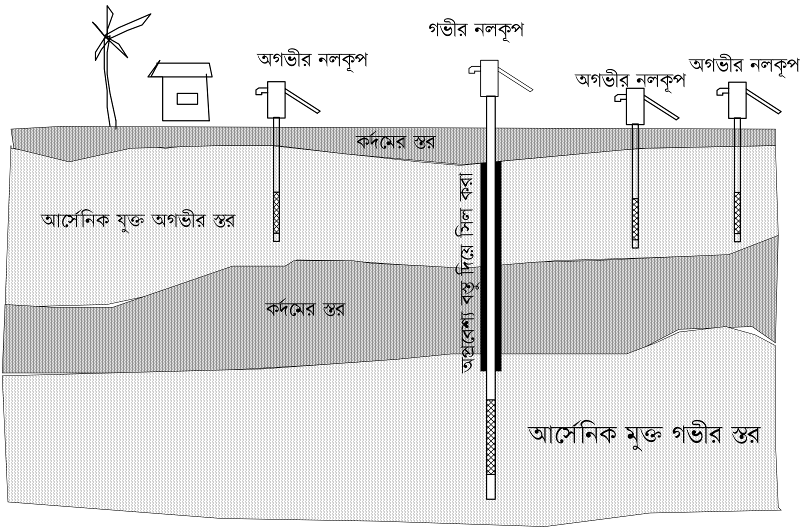
গভীর নলকূপ
অগভীর নলকূপ
অগভীর নলকূপ
অগভীর নলকূপ
কর্দমের স্তর
আর্সেনিক যুক্ত অগভীর স্তর
অপ্রবেশ্য বস্তু দিয়ে সিল করা
কর্দমের স্তর
আর্সেনিক মুক্ত গভীর স্তর

ইঁদারা বা পাতকূয়ো

নলকূপ এবং কলের জল আসার পরে ইঁদারা এবং পাতকূয়ো জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। এখন বহু বাড়িতেই পুরোনো কুয়োগুলি অবহেলায় পড়ে আছে। কুয়োর জল সবসময়ে বাতাসের সংস্পর্শে থাকে বলে জল থাকে জারক পরিবেশে। এর ফলে জলে আর্সেনিক থাকলেও তা দ্রবীভূত অবস্থায় থাকতে পারেনা। কোনো কোনও জায়গায় এই কুয়োগুলো এমন একটা স্তরে বসানো যায় যে স্তরে আর্সেনিকের পরিমাণ বিপজ্জনক নয়। উত্তর চব্বিশ পরগণার কয়েকটি আর্সেনিক দূষিত গ্রামে বিকল্প উৎস হিসাবে কম গভীরতার কংক্রিটের কুয়ো বসানো হয়েছে। এগুলোর গভীরতা ২০ থেকে ৩০ ফুট। এগুলোর সাথে হ্যান্ড পাম্প বসিয়ে জল তোলার ব্যাবস্থা করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে এই সব কূয়োতে জলে আর্সেনিকের পরিমাণ ০.০৫ মিলিগ্রামের থেকে কম। এই সব কুয়োর জল ব্যবহার করার জন্য গ্রাম বাসীদের সচেতনতা গড়ে তোলা হয়েছে। অন্য সব বিকল্প উৎসের মত এই জলেও জীবাণুর পরিমাণ যথেষ্ট থাকার সম্ভাবনা।

গভীর নলকূপ

এখন পর্যন্ত যা ভূতাত্বিক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তাতে ধারণা করা হয়েছে আর্সেনিক যুক্ত ভূসলিলাধার একটা নির্দিষ্ট গভীরতা (১০০ থেকে ১৫০ মিটার) পর্যন্ত বিস্তৃত। এ পর্যন্ত এই গভীরতায় যে সব নলকূপ বসানো হয়েছে কেবল সেই সব নলকূপের জলেই আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। খুব কম গভীরতার নলকূপের জলে আর্সেনিক রয়েছে খুব বেশী। কিন্তু আর্সেনিক যুক্ত ভূসলিলাধার গুলির নীচে আরো ভূসলিলাধার রয়েছে যা ওপরের ভূসলিলাধার থেকে একটি পুরু কর্দমের স্তর দিয়ে পৃথক করা আছে। এই সব সলিলাধারে কোনও নলকূপ বসালে তা আর্সেনিক মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা। কিছু সতর্কতা অবলম্বন করে নলকূপের গর্ত দিয়ে ওপরের জলের প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিলে এই সব নলকূপ থেকে আর্সেনিক মুক্ত জল পাওয়া যাবে। পশ্চিমবঙ্গে এই রকম কিছু নলকূপ বসানো হয়েছে।ক্কসত্রংহক্কক্কং

আরও কিছু

মেক্সিকোর জিয়াম্প্সঁ বলে একটি জায়গায় ভূগর্ভের জলে ১.০ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার পর্যন্ত আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু এই জলকে আর্সেনিক মুক্ত করার জন্য স্থানীয় গ্রামবাসীরা নিজস্ব একটি পদ্ধতি বের করেছে। এই পদ্ধতিতে জলে আর্সেনিকের পরিমাণ ০.০৫ মিলিগ্রাম প্রতি লিটারের থেকে নীচে নামিয়ে আনা যায়। এই অঞ্চলে কর্দমযুক্ত চূনাপাথর পাওয়া যায়। এর মধ্যে কেওলিনাইট ও ইলাইট নামক দুটি মণিক আছে। এই পাথরের মধ্যে দিয়ে আর্সেনিক যুক্ত জলকে প্রবাহিত করলে জলের আর্সেনিকের মাত্রা ১.০ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার থেকে ০.০৩ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার পর্যন্ত নামিয়ে আনা যায়। খুব কম খরচে স্থানীয় ভাবে এই আর্সেনিক দূরীকরণ পদ্ধতি কাজ করছে।

জনসচেতনতা

আর্সেনিক দূষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রথম ও প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে জনসচেতনতা। পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের এত মানুষ যে আর্সেনিক দূষণের শিকার হয়েছেন তার কারণ অনেকটাই যে তাঁরা এই আর্সেনিক বিষক্রিয়ার উপসর্গ গুলি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। তাদের ধারণাই ছিল না যে নলকুপের জল যা তাঁরা নিশ্চিন্তে এতদিন পান করে এসেছেন এবং যে জলকে এতকাল সবচেয়ে নিরাপদ বলে বলা হত তার ভেতরে এত ভয়ঙ্কর বিষ রয়েছে। এখন আর্সেনিক সম্পর্কে কিছু মানুষ সতর্ক হওয়ার পরে আরও একটা ভুল ধারণা গড়ে উঠছে যে আর্সেনিক আক্রান্ত ব্লক বা গ্রামে সব কয়টি নলকূপের জলেই আর্সেনিক রয়েছে। যদিও যত বেশী সমীক্ষা হছে ততই নতুন নতুন এলাকা আর্সেনিক দূষিত এলাকা বলে চিহ্নিত হচ্ছে। কিন্তু তা সত্বেও বলা যায় একমাত্র জনসচেতনতা এবং আর্সেনিক দূরীকরণ প্রকল্পগুলিতে জনগণেব অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই আর্সেনিক দূষণ মুক্ত সমাজ গড়ে তোলা যায়।

এই সচেতনতা বৃদ্ধির কয়েকটি ধাপ আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হল স্বাস্থ্য সচেতনতা। দেখা গিয়েছে চামড়ার উপসর্গ গুলিকে প্রথমে গ্রামের সাধারণ মানুষেরা বিশেষ গুরুত্ব দেননা। কিন্তু এই উপসর্গ আর্সেনিকের কারণেও হতে পারে এই ধারণা থাকা দরকার

এবং যত তাড়তাড়ি সম্ভব তা চিকিৎসক ও কর্তৃপক্ষের নজরে আনা দরকার। অনেক সময়ে নিজেদের শরীরের উপসর্গগুলিকে পর্যবেক্ষণ করে গ্রামের মানুষেরা নিজেরাই দূষিত নলকূপটিকে চিহ্নিত করতে পারবেন। এর পরের পদক্ষেপে তাঁদের জানা থাকা দরকার কোথায় কোথায় আর্সেনিকের পরীক্ষাগার আছে বা তাদের কাছাকাছি কোন সরকারি বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আর্সেনিক পরীক্ষা করতে পারেন।

আর্সেনিক আক্রান্ত নলকূপগুলিকে চিহ্নিত করা দরকার। কোনো একটি সংস্থা সুপারিশ করেছেন যে আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত নলকূপগুলিকে লাল রঙ এবং ভালো নলকূপগুলিকে নীল রঙ করে দেওয়া দরকার যাতে গ্রামের লোকেরা সহজেই ভালো নলকূপটিকে চিনতে পারেন।

একট জিনিষ লক্ষ্য করা গিয়েছে যে আর্সেনিক আক্রমণের সথে ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে। যে সব অঞ্চলের মানুষেরা মোটামুটি ভাবে স্বস্থ্য সচেতন এবং পুষ্টিকর খাবার খান তাদের দেহে আর্সেনিকের লক্ষণ প্রকাশ পায় দেরীতে বা আনেক ক্ষেত্রে তারা সুস্থই থাকেন। জনসচেতনতার সাথে জনস্বাস্থ্য বিষয়টিকেও দেখা দরকার। এটাও সচেতনতা প্রসারের একটা দিক হতে পারে।

জনগণের অংশগ্রহণে আর্সেনিক দূরীকরণ প্রকল্প (peoples participatory arsenic mitigation programme)

বাংলাদেশে ও পশ্চিমবঙ্গে জনগণের অশগ্রহণে আর্সেনিক দূরীকরণ প্রকল্পগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় এবং সফল হয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগণার কিছু গ্রামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পগুলি শুরু হয়। এই প্রকল্পগুলিতে ঠিক করা হয় গ্রামে আর্সেনিক আক্রান্ত নলকূপের সাথে একটি আর্সেনিক ফিল্টার বসানো হবে। এই ফিল্টার গুলির দাম খুব বেশী এবং রক্ষণাবেক্ষণের খরচও যথেষ্ট। এ ক্ষেত্রে ফিল্টার বসানোর খরচ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অনুদান হিসেবে জোগাড় করে দেবে। কিন্তু প্রতিবারের ফিল্টার বদলানোর খরচ বা পরিশ্রুতকরণের খরচ গ্রামবাসীকেই বহন করতে হবে। এতকাল ধরে যারা বিনামূল্যে জল পেয়ে এসেছে তাদের মাথায় জলের জন্য খরচ করার চিন্তা ঢুকিয়ে দেওয়া সোজা কাজ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ এবং এর ওপরেই প্রকল্পগুলির সফলতা নির্ভর করছে।

এই প্রকল্পে প্রথম কাজই হচ্ছে যে গ্রামে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেখানে জলের রাসায়নিক পরীক্ষা, কিছুটা সলিলভূতাত্বিক সমীক্ষা এবং সম্পূর্ণভাবে আর্থসামাজিক সমীক্ষা করা দরকার। আর্থসামাজিক সমীক্ষার মাধ্যমে গ্রামের মানুষদের আর্থিক অবস্থা, সাধারণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ও অবস্থান, এই প্রকল্পে তারা কতটা সাড়া দেবে প্রাথমিক ভাবে তা জেনে নেওয়া যাবে। এর পরে চিহ্নিত করা দরকার আর্সেনিক আক্রান্ত ব্যক্তিদের। এদের দেহে রোগের লক্ষণ কতটা প্রকাশ পেয়েছে তা অনুযায়ী রোগীদের শ্রেনী বিভাগ করা দরকার এবং গ্রামে আর্সেনিক দূষণের প্রকোপ কতটা তাও বোঝা দরকার। এই দুটো কাজের পরের কাজ গ্রামের লোকদের নিয়ে বারবার আলোচনা করে আর্সেনিক দূষণের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেওয়া ও

তাদেরকে পুরো প্রকল্প এবং সেই প্রকল্পে তাদের অংশ গ্রহণ কতটা জরুরী তা অনুধাবন করানো দরকার।

এর পরে পদক্ষেপ গ্রামে বেনিফিশিয়ারী কমিটি তৈরী করে দেওয়া। এই কমিটিই পরে পুরো প্রকল্পটি পরিচালনা করবে। কমিটি তৈরী করার কাজে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা খুবই জরুরী। পঞ্চায়েতের সাহায্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি গ্রামের যারা এই প্রকল্প ব্যবহার করবে তাদের আর্থিক দায়িত্ব কতটা তা জানিয়ে দেবে। এই ব্যাপারে যাতে গ্রামের লোকেরা পিছিয়ে না যায় তার জন্য বারবার তাদের বোঝানো দরকার ও সচেতন করে তোলা দরকার।

আর্সেনিক ফিল্টার বসানোর জন্য সঠিক নলকূপটি খুঁজে বের করা একটু কষ্ট সাধ্য কাজ। কারণ গ্রামের প্রতিটি লোকই চাইবে সেটি তার বাড়ির কাছে হোক। এ ক্ষেত্রে গ্রামের লোকেদের ওপরেই এই কাজের ভার দিয়ে দেওয়া ভালো। বেনিফিশিয়ারী কমিটি কূপটি চিহ্নিত করে দেওয়ার পরে ঠিক করতে হবে রক্ষণাবেক্ষণের খরচ কত এবং পরিবার পিছু মাসে কত চাঁদা দিতে হবে এবং কে এই প্রকল্পটির পরিচালনার ভার নেবে। জলের জন্য টাকা দেওয়ার ব্যাপারে গ্রামের লোকেরা স্বভাবতঃই অনাগ্রহী। তাই দেখা গিয়েছে এই প্রকল্পগুলি প্রথম দিকে বিশেষ জনপ্রিয়তা পায়নি। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই গ্রামের লোক বুঝতে পেরেছে আর্সেনিক মুক্ত জল পান করা কতটা প্রয়োজন। তারপর থেকে অনেক ক্ষেত্রেই টাকা তোলার ব্যাপারে কোনও সমস্যা হয়নি। এই ধরণের একট প্রকল্পে পরিবার পিছু মাসিক চাঁদা পড়ে ২০ থেকে ৩০ টাকা।

বেনিফিশিয়ারী কমিটির হাতে প্রকল্প পরিচালনার ভার তুলে দেওয়ার পরও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটির কাজ শেষ হবেনা। তাকে জলের রাসায়নিক পরীক্ষার কাজ এবং সচেতনতা প্রসারের কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

ইউনিসেফ, কেয়ার, রোটারি ইন্টার্ন্যাশনাল, প্রোশিকা, ইসলামি ব্যাঙ্ক, কানাডা এনভায়রণমেন্ট ফেসিলিটি, ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা আর্সেনিক মুক্ত করণের কাজে অনুদান দিয়ে থাকেন।

আর্থসামাজিক সমীক্ষা

আর্সেনিক দূষণের প্রভাব একটা পরিবার বা একটা গ্রামের আর্থসামাজিক অবস্থার বিশাল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিতে পারে বা আর্সেনিক দূষণে কে কতটা আক্রান্ত হবেন তার অনেকটা তাঁর আর্থসামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করছে। দেখা গেছে সমপরিমাণ আর্সেনিক দুষিত জল পান করে দুটি ব্যাক্তি বা দুটি পৃথক গোষ্ঠির মানুষ এক রকম ভাবে অসুস্থ হচ্ছেনা। এর কারণ হিসাবে খাদ্যাভ্যাস, এবং পরিবেশের প্রভাবকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। আর্সেনিকোসিস এবং পারিবারিক রোজগার দুটোর মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে বলে ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল মনে করেন। কোনও মানুষের দেহে আর্সেনিকোসিসের প্রকোপ বা উপসর্গগুলো দেহে প্রকাশিত হবার মাত্রা নির্ভর করে তার শরীর থেকে মূত্রের সাথে কী পরিমাণ আর্সেনিক নির্গত হচ্ছে বা কী পরিমাণ আর্সেনিক সে তার দেহে জমা করছে। এই জমার

পরিমাণ যার দেহে যত বেশী আর্সেনিকোসিসে সে তত বেশী আক্রান্ত। আর একটা ব্যাপার হল লিঙ্গভেদ। একজন স্ত্রী এবং একজন পুরুষ একই জল সমপরিমাণে ব্যাবহার করে না। তার কারণ পুরুষটিকে কাজের সূত্রে বাইরে যেতে হয়। কাজেই সে আর্সেনিক যুক্ত এবং আর্সেনিক মুক্ত দুরকম জল পানেরই সুযোগ পায়।

ব্যাক্তিগত স্বাস্থ্যের ওপর আর্সেনিকের যথেষ্ট প্রভাব আছে। লিভারের অসুখে যাঁরা ভুগছেন তাদের আর্সেনিকোসিস ও চামড়ার ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। পুষ্টির ওপর আর্সেনিকের প্রভাবের ওপর প্রচুর কাজ হয়েছে। তাইওয়ানের একটি গ্রামে সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে সেই গ্রামে ব্ল্যাকফুট ডিজিজে আক্রান্ত ব্যাক্তিদের খাবারে প্রোটিনের পরিমাণ খুবই কম। আরও পরীক্ষায় জানা গিয়েছে প্রোটিন এবং ভিটামিন বিশেষ করে ভিটামিন বি ১২ শরীরে আর্সেনিক প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়ায়। এই কারণে দক্ষিণ এসিয়ার দেশগুলিতে যেখানে মেয়েদের পুষ্টির পরিমাণ কম সেখানে তাদের আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

আর একটা জিনিস দেখা গিয়েছে যে দুটি ধাতু সেলেনিয়াম এবং জিঙ্ক শরীরে আর্সেনিক জমা হওয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। চীনের তাইওয়ান অঞ্চলের ব্ল্যাকফুট ডিজিজে আক্রান্ত এলাকায় এই জিঙ্ক ও সেলেনিয়ামের অভাব আছে। বাংলাদেশের সামতা গ্রামে এশিয়া আর্সেনিক নেটওয়ার্ক যে গবেষণা ও সমীক্ষা চালিয়েছিল সেখানে তারা পারিবারিক আর্থিক রোজগারকে পুষ্টি মাপার একটি বিকল্প মাপকাঠি হিসাবে ধরে নেয়। তারা এটা লক্ষ্য করে যে পারিবারিক রোজগার ও আর্সেনিকোসিসের মধ্যে একটা বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। এ ছাড়া বাড়িতে খাদ্য বন্টনের অসমতাও একটা পরিবারে কোন ব্যক্তিটি আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত হচ্ছেন তা নির্ধারিত করতে পারে।

পারিবারিক রোজগারের ওপর জল ব্যবহারের পদ্ধতিও নির্ভর করে। বাংলাদেশের লক্ষীপুর অঞ্চলে লোকেরা ছোটো ছোটো মাটির পাত্রে জল ধরে রাখে। সে জলে আর্সেনিক থাকলে তা লোহার অক্সাইডের সাথে থিতিয়ে পড়ে। ফলে গাদের মধ্যে আর্সেনিকের পরিমাণ বেড়ে গেলেও পানীয় জলে আর্সেনিক কমে যায়। উচ্চ আয়ের মানুষেরা আরও বড় জল সংরক্ষণের পদ্ধতি নিজের বাড়িতেই বসাতে পারে এবং আরও বেশী সময় ধরে জলকে থিতোবার সুযোগ দিতে পারে।

কোথাও কোথাও কোনও পরিবারের সামাজিক অবস্থানের ওপর বা তার আর্থসামাজিক মানের ওপর নির্ভর করে সেই পরিবার কোন নলকূপ থেকে জল নিতে পারবে। অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন আয়ের মানুষেরা আর্সেনিক যুক্ত নলকূপ ছাড়া অন্যখান থেকে জল নেওয়ার অধিকার পায় না। বিশ্বের বহু দেশেই এই সামাজিক বৈষম্য রয়েছে।

আর্সেনিকে আক্রান্ত এলাকায় আর্থসামাজিক সমীক্ষা করার জন্য নীচের কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ করার দিকে জোর দিতে হবে।

ক, জনসমীক্ষা

১) পরিবারের আকার ২) বয়স ও লিঙ্গ ৩) প্রাপ্তবয়স্কদের বৈবাহিক অবস্থান

খ, আর্থিক আয় ও সম্পত্তি

১) জীবিকা ও আয় ২) অসংগঠিত বা দৈনিক রোজগার করেন এমন পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তির দৈনিক মজুরী ৩) নিজের উৎপাদিত খাদ্য যেমন নিজের ফল সব্জি ইত্যাদির অর্থমূল্য ৪) স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির (পশু সহ) পরিমাণ ও মূল্য ৫) বাজারে ধারের পরিমাণ

গ, খরচের ধারা ও পরিমাণ

১) খাদ্য ও বস্ত্র ২) শিক্ষা ৩) স্বাস্থ্য ৪) জল ৫) জ্বালানী ৬) প্রতিপালন (বাড়ি, জলের ব্যবস্থা ইত্যাদি) ৭) অন্যান্য

গ, শিক্ষার মান

১) প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা ২) স্কুলে উপস্থিতির মান

ঘ, জলবন্টন ব্যবস্থা

১) পানীয় জলের উৎস ও তার মালিকানা ২) রান্নার জলের উৎস ৩) অন্য গৃহকাজের জলের উৎস ৪) জল সংগ্রহ করতে পরিবারের সদস্যদের কত দূরে যেতে হয় এবং কত সময় ব্যয় করতে হয়।

ঙ, গৃহ

১) ঘরের চাল অস্থায়ী বস্তু দিয়ে তৈরি কিনা ২) খড়ের চাল ৩) টিনের / পাকা ছাদ

চ, স্বাস্থ্য

১) চিকিৎসা করার পয়সা আছে কিনা ২) রোগের (আর্সেনিকোসিস) অবস্থা (মেলানোসিস, কেরাটোসিস পর্যায় ১, পর্যায় ২, ক্যানসার) ৩) চিকিৎসার ধাপ বা পদ্ধতি (চিকিৎসার মান, হাসপাতালে চিকিৎসা, স্থানীয় চিকিৎসা ইত্যাদি) ৪) চিকিৎসার খরচ কে বহন করছে ৫) অপরে বহন করলে তা কিভাবে নির্বাহ হচ্ছে।

আর্সেনিকে আক্রান্ত হলে জীবিকার ওপর তার প্রভাব পড়ে। ঘরে বাইরে কয ও পরিবারের সদস্যদের আচরণ ও দৈনন্দিন কাজের ধারার পরিবর্তন হয়। শিশুরা আক্রান্ত হলে তাদের শিক্ষার ওপর প্রভাব পড়ে, কারণ তারা স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দেয়। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি সমীক্ষা করা দরকার।

১) কত শতাংশ কাজের দিন নষ্ট হচ্ছে (প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে) ২) কত শতাংশ স্কুলের দিন নষ্ট হচ্ছে (শিশুদের ক্ষেত্রে) ৩) জীবিকার ক্ষেত্রে অন্য সদস্যদের ওপর কতটা বাড়তি চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তা মাপা। ৪) খাদ্য জোগার ও খাদ্য গ্রহণে কতটা টান পড়েছে বা পরিবারের লোকেরা খাদ্যের ব্যাপারে কতটা ত্যাগ স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে তার পরিমাপ করা। ৫) জমা টাকা কতটা খরচ হয়ে যাচ্ছে ৬) ধার হচ্ছে কিনা বা কতটা ধার হচ্ছে।

এর পরবর্তি পদক্ষেপ এই আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত পরিবার গুলো সামাজিক ভাবে কতটা সংবেদনশীল। তারা প্রতিটি নলকূপের আর্সেনিক পরীক্ষা চাইছে কিনা বা আর্সেনিক বিষয়ে নিজেরা জ্ঞান লাভ করতে চাইছে কিনা। গ্রামের অন্য সকলের সাথে তারা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ভাগ করতে চাইছে কিনা।

এই সব সমীক্ষার মাধ্যমে একটি সংস্থা বুঝতে পারবে একটা আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চলে মানুষদের সচেতনতার মান কতটা এবং কি ভাবে এই সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়।

শেষের কথা

বিশ্বের মৌলিক পদার্থের মধ্যে আর্সেনিকের স্থান কুড়ি নম্বরে। কাজেই এর আসন পাতা রয়েছে সর্বত্র। কোথাও এ আছে এক মিলিগ্রামের হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম পরিমাণে প্রতি লিটারে বা প্রতি কেজিতে আবার কোথাও এর পরিমাণ হাজার গুণ বেশী। আর্সেনিক কেন কোথাও বেশী কেন কোথাও কম তার পেছনে প্রকৃতির হাত আছে এবং কোথাও কোথাও মানুষের। আর্সেনিক কিছু পরিমাণে আমাদের শরীরেও আছে। খুব কম মাত্রায়। শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া খাবার, জল বা বাতাসের থেকে শরীরে প্রবেশ করা আর্সেনিক বের করে দেয়। কিন্তু এর মাত্রা বেশী হয়ে গেলে তবেই বিপদ। আর্সেনিক ভূগর্ভের জলে পাওয়া গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আটটি জেলায় আর বাংলাদেশের চৌষট্টিটি জেলায়। আজ বিশাল এক জনগোষ্ঠি এই আর্সেনিকের কবলে। নিত্যই নতুন নতুন কূপে আর্সেনিক আবিষ্কৃত হচ্ছে। কিন্তু সত্যিইকি আর্সেনিকই শেষ কথা বলবে নাকি মানুষ এই দুর্যোগ থেকে বেরিয়ে আসবে। এর উত্তর রয়েছে মানুষের সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার ও বাঁচিয়ে রাখার সদিচ্ছায়। এখন পর্যন্ত দেখা গিয়েছে যত নলকূপে আর্সেনিকের পরীক্ষা হয়েছে, গড়ে মাত্র ২৫ শতাংশ কূপের জলে আর্সেনিক আছে। তার মানে ৭৫ শতাংশ আর্সেনিক মুক্ত কূপ। গভীর নলকূপে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে অতি নগন্য সংখ্যায়। যেগুলোতে পাওয়া গিয়েছে তাদের আর্সেনিক যুক্ত ভূসলিলাধারের সাথে যোগ আছে। পুকুরের জল শোধণ করলে তা পানের উপযুক্ত এবং তাতে আর্সেনিক নেই। নিরন্তর গবেষণার পথ খোলা আছে। মানুষের প্রয়াসেরও শেষ নেই। যেদিন সমাজের সকলের মুখে পুষ্টিকর খাদ্য জুটবে। মানুষ ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন হবে। বিকল্প জলের উৎসগুলি গরীব মানুষের অধিগম্য হবে সেদিন আর্সেনিককে কিসের ভয় ?

পরিশিষ্ট

আর্সেনিকের ওয়েবসাইট

আর্সেনিকের ওপর বিভিন্ন তথ্য এখন নানা ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। ইন্টারনেটে এখন হাজার হাজার সাইট আছে যেখানে আর্সেনিকের ওপর বিভিন্ন গবেষণার তথ্য প্রকাশিত হয়। এই সব সাইটের কয়েকটির ঠিকানা এখানে দেওয়া হল। এই সব সাইট থেকে আরও অন্য সাইটের খবর পাওয়া যাবে।

১) University College London Arsenic page
http://www.ucl.ac.uk/geolsci/lag/as/
২) Susan Murcott's Arsenic Remediation WebSite
http://web.mit.edu/shaheer/www/arsenic/
৩) Arsenic in Drinking Water: NAS 2001 Update
http://www.nap.edu/catalog/10194.html
৪) University of Waterloo
http://www.science.uwaterloo.ca/research/ggr/
৫) SOS Arsenic.net http://www.sos-arsenic.net/
৬) Arsenic Solutions Inc. http://www.arsenic-solutions.com/arsenic_biotest.htm
৭) National Pure Water Association http://www.npwa.freeserve.co.uk/
৮) Arsenic Crisis Information Center http://bicn.com/acic
৯) Bangladesh government arsenic site http://www.bamwsp.org/
১০) Arsenic in US Groundwater http://co.water.usgs.gov/trace/arsenic/
১১) US Geological Survey's Water Quality Program
http://water.usgs.gov/nawqa/nawqa_home.html
১২) Join the Arsenic Source Group http://www.egroups.com/invite/arsenic-source
১৩) USGS Search Engine http://www.usgs.gov/usgssearch.html
১৪) Biochemical Mechanisms of Arsenic Detoxification
http://boatman.med.wayne.edu/~rosenlab
১৫) British Geological Survey http://www.bgs.ac.uk/arsenic/
১৬) London Arsenic Group http://www.ucl.ac.uk/geolsci/lag/as/index.htm
১৭) Arsenic in Drinking Water
http://www.nap.edu/readingroom/enter2.cgi?0309063337.html
১৮) A recent report http://www.nap.edu/catalog/6444.html
১৯) Asia Arsenic Network
http://phys4.harvard.edu/~wilson/arsenic_project_japan2.html

২০) USEPA- Arsenic in Drinking Water
http://www.epa.gov/safewater/dwinfo.htm
২১) EPA grants list http://es.epa.gov/ncerqa/grants/97/arsenic.html
২২) World Bank main arsenic site http://www.worldbank.org/sararsenic
২৩) WHO - arsenic lectures series http://www.who.int/peh-super/othlec/ars.html
২৪) Groundwater Arsenic Research Group (GARG)
http://amov.ce.kth.se/PEOPLE/Prosun/Prosun.htm
২৫) Groundwater Pollution by arsenic http://www.pobox.com/~skobayashi
২৬) Dainichi Consultant, Inc
http://www.dainichi-consul.co.jp/english/arsen.htm
২৭) UCBerkeley/Dr. Alan H. Smith http://socrates.berkeley.edu/~asrg/
২৮) Water & Health in Europe http://www.who.dk/London99/water03.htm
২৯) London School of Hygiene and Tropical Medicine
http://www.lshtm.ac.uk/php/eeu/eeuintro.htm
৩০) UNICEF Web site on Arsenic http://www.unicef.org/arsenic
৩১) পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্য জল অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ http// www.wbwidd.org
৩২) Ghosh Research (Bengal Basin Homepage)
http://nvo.com/ghosh_research/door/
৩৩) Harvard School of Public Health http://www.hsph.harvard.edu/
৩৪) Dartmouth Superfund Project: Arsenic
http://www.dartmouth.edu/~dcsbrp/arsenic.html
৩৫) CSIRO Australia http://www.clw.csiro.au/
৩৬) SCRCWMPC-ANSTO http://www.arsenic.org/
৩৭) Hydrogeology in Maine and Mexico
http://abacus.bates.edu/~longley/reu/
৩৮) Arsenic Contamination in Bangladesh http://www.bcas.net/arsenic/
৩৯) Dr Dipenkar Chakraborti (Calcutta)
http://www.geocities.com/Broadway/Booth/6784/dcpoetju.html
৪০) Medical University of Bangladesh
http://www.angelfire.com/ak/medinet/arsenic.html
৪১) West Bengal http://www.mayapurtrust.org/arsenic_crisis.html
৪২) data on arsenic http://www.atsdr.cdc.gov/
৪৩) SCORECARD http://www.fordhamprep.pvt.k12.ny.gcurran/3rdquart/aselem.htm
৪৪) ARSENIC AND CERTAIN ARSENIC COMPOUNDS
http://ntp server.niehs.nih.gov/htdocs/8_RoC/KC/Arsenicandcmpds.html
৪৫) Arsenic in treated wood http://www.origenbio.com/arsenic.html
৪৬) The Mineral Native Arsenic

http://www.galleries.com/minerals/elements/arsenic/arsenic.htm

৪৭) WHO Library Catalog
http://saturn.who.ch/uhtbin/cgisirsi/mQLPjyUYpc/21086010/60/30007

কলকাতার আর্সেনিক

কলকাতা আজ এক বিশাল মহানগরে পরিণত হয়েছে। কলেবর এবং জনসংখ্যা এই দুই দিক দিয়েই কলকাতা দ্রুত বাড়ছে। এর ফলে সবচেয়ে বেশী যে প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা এবং ব্যবহার বেড়েছে তা হল জল। কলকাতার জলের যে চাহিদা তার ৯৯ শতাংশই হচ্ছে মানুষের গার্হস্থ প্রয়োজনে। বাকি ১ শতাংশ জল সামান্য কিছু কল কারখানায় ব্যবহার করা হয়। এই জল সরবরাহের সিংহভাগ দায়ভার বহন করেন কলকাতা কর্পোরেশন।

কলকাতার জল সরবরাহের ইতিহাস শুরু হচ্ছে ১৮৭০ সাল থেকে যখন কলকাতা মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তার আগে কলকাতার জল সরবরাহের সবটাই ছিল ব্যক্তিগত। ভিস্তিরা গঙ্গা থেকে জল ভরে নিয়ে আসত। বড় লোকেরা সারা বছরের জল বড় বড় জালায় সঞ্চিত করে রাখত। এই চিত্র আমরা কলকাতার পুরানো সাহিত্য ও চিত্রকলা থেকে পাই। সেই সময়, ১৮৬৫ থেকে ১৮৬৯ সালের মধ্যে এক পরিসংখ্যানে জানা যায় কলেরায় প্রতি বছর প্রায় সাড়ে চার হাজার মানুষ মারা যেত। ১৮৭০ সালে পলতায় গঙ্গা থেকে জল তুলে শোধন করে পাইপের মাধ্যমে বাড়িতে বাড়িতে সরবরাহের ব্যবস্থা চালু হল। সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৬০ লক্ষ গ্যালন প্রতি দিন। দেখা গেল এর ফলে কলেরায় মৃতের সংখ্যা কমে দাঁড়ালো বছরে ১৪০০।

এর পর কলকাতার জনসংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকলো। ১৯৪১ সালে কলকাতার জনসংখ্যা এসে দাঁড়ালো তিরিশ লক্ষে। এই বিপুল জনসংখ্যার জন্য জলের জোগান দিতে পলতার সরবরাহ বড়ানো হল এবং বর্তমানে এর পরিমাণ ১৬০০ লক্ষ গ্যালন প্রতি দিন।

পলতার যোগানের সাথে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে গার্ডেনরীচ জল সরবরাহ প্রকল্প। এর পানীয় জল সরবরাহের পরিমন ৩৫০ লক্ষ গ্যালন প্রতি দিন। কিন্তু কলকাতার জনসংখ্যা ক্রমশ: বৃদ্ধি পওয়ায় এবং টালিগঞ্জ মিউনিসিপালিটি, যাদবপুর, বাঁশদ্রোণী, ব্রহ্মপুর, ঠাকুরপুকুর ইত্যাদি অঞ্চল কলকাতা কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে শোধণ করা গঙ্গার জল এই দক্ষিণ অঞ্চলের চাহিদা মেটাতে পারল না। এর ফলে কলকাতায় ক্রমশ: নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভের জল উত্তোলন শুরু হল। বর্তমানে কলকাতায় ১২০০ উচ্চ ক্ষমতাশালী গভীর নলকুপ এবং ১২০০০ হ্যান্ডপাম্প লাগানো নলকূপ আছে (১৯৯১ সালের হিসাব)। কিন্তু কলকাতার অগভীর বা গভীর নলকূপের প্রকৃত সংখ্যা এখনও অজানা। কলকাতায়, বিশেষ করে মধ্য পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ কলকাতায় কি বিপুল পরিমাণ ভূগর্ভের জল উত্তোলন হয় তার প্রকৃত হিসাব এখনও শেষ হয় নি। কিন্তু কলকাতার ভৌম সলিলাধারের বর্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করলেই চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

ভূগর্ভের জল যে স্তরে পাওয়া যায় তাকে বলে ভৌম সলিলাধার বা একুইফার। কলকাতার মাটির নীচে এই রকম কয়েকটি ভৌম সলিলাধার বা একুইফার আছে যা থেকে জল উত্তোলন করা হয়ে থাকে। এই ভৌম সলিলাধার গুলির ওপরে রয়েছে পুরু কর্দমের স্তর যার সান্দ্রতা বেশি হলেও জল পরিবাহিতা খুবই কম । ফলে কলকাতার বৃষ্টির সাথে এই ভৌম সলিলাধার বা একুইফার এর যোগাযোগ প্রায় নেই। এই সব কর্দমের স্তর সব সময় জলে সংপৃক্ত থাকে কিন্তু নীচে অবস্থিত ভৌম সলিলাধার বা একুইফারকে পুষ্ট করার কাজে বিশেষ কোনো সাহায্যই করে না।

কলকাতার ভৌম সলিলাধারের যোগ রয়েছে উত্তরে নদীয়া ও উত্তর ২৪ পরগণা জেলার ভৌম সলিলাধারের সাথে। সেখনে মুক্ত ভৌম সলিলাধার বৃষ্টির জল গ্রহণ করে ও সেই জল ভূগর্ভের ভেতর দিয়ে কলকাতার নীচে আসে। কাজেই দেখা যাচ্ছ কলকাতার ভৌম সলিলের যে গতিপথ তা হওয়ার কথা উত্তর থেকে দক্ষিণে । প্রকৃত পক্ষে ২০/৩০ বছর আগে তাই ছিল।

কলকাতায় ভূগর্ভের জল উত্তোলন বেড়ে যাওয়ায় উত্তর থেকে জলের যোগান উত্তোলনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারলো না, কারন এই প্রকৃতিক সরবরাহের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। ফলে চাহিদার জায়গা গুলিতে টান পড়ল। কলকাতায় জলের স্তর ক্রমশ: নেমে যেতে শুরু করল। গত কুড়ি বছরে বলিগঞ্জ, পার্ক সার্কাস থেকে শুরু করে মধ্য কলকাতার বিস্তির্ণ অঞ্চলে জলর স্তর ১০ থেকে ১২ মিটার নীচে নেমে গেল। ভূগর্ভের জলের স্তরের উপরিভাগ কে ওয়াটার টেবিল অথবা পিজোমেট্রিক লেভেল বলা হয়। কলকাতার ক্ষেত্রে এই পিজোমেট্রিক লেভেল ছিল উত্তর থেকে দক্ষিনে ঢালু। কিন্তু এখন তার চেহারাটা দাঁড়িয়েছে অনেকটা ফানেলের মত। অর্থাৎ চারিদিকের জল এখন কলকাতার কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

জল স্তরের এই পরিবর্তন একটা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করল। কলকাতার দক্ষিন বা পূর্ব দিকে যে ভৌম সলিল স্তর রয়েছে তা বদ্ধ তো বটেই উপরন্তু তার মধ্যে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ ও খুব বেশী। এখন এই জল ক্রমশ: কলকাতার দিকে ধাবিত হয়ে কলকাতার জলে লবণের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলল। সর্ব শেষ যে সমস্যা কলকাতার জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে তা হল আর্সেনিক দুষণের সমস্যা। কলকাতার কোনও কোনও অঞ্চলে ভূগর্ভের জলে আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে এবং সংবাদ পত্রে তার খবর জনমানসে যথেষ্ট উদ্বেগের সঞ্চার করেছে।

এই অর্সেনিক জনিত সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র নতুন নয়। গত পনের কুড়ি বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অর্সেনিক নিয়ে অনেক কথাই জেনেছে। বহু লোক এর বিষক্রিয়ার শিকার ও হয়েছেন। কিন্তু কলকাতায় ব্যাপারটা নতুন। কিন্তু, একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায় যখন সমগ্র গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে ভূগর্ভের জলে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে তখন কলকাতা এর থেকে মুক্ত হতে পারে না। কিন্তু কলকাতার আর্সেনিক এতকাল আমাদের দৃষ্টি অকর্ষণ করেনি তার কারণ প্রথমত: কলকাতায় কোনও আর্সেনিক রুগির সন্ধান পাওয়া যায় নি । সংবাদ পত্রে যাদবপুরের স্কুল অফ এনভায়রন্টাল স্টাডিজ কর্তৃক কিছু সমীক্ষার বিবরণ প্রকাশের পর এই

সমস্যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে আলিপুর অঞ্চলে ১৫০ মিটারের বেশী গভীরতায় আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে এবং বাঁশদ্রোণী অঞ্চলে ৩০ মিটারের কম গভীরতায় আর্সেনিক পাওয়া গিয়েছে। দেখা যায় প্রথম ,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে আর্সেনিক আছে। এবং তাও দক্ষিণ কলকাতায় কোনও কোনও অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। এত জায়গা থাকতে এই কয় স্থানেই কেন আর্সেনিক পাওয়া গেল তা প্রণিধান যোগ্য বিষয়। এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের কলকাতার ভূতত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হবে। কারণ আজ আর এ কথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই যে পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিকের উৎস পুরোপুরি ভূতাত্বিক। কিন্তু কোথায় এর সীমাবদ্ধতা এটাই মূল বিষয়।

কলকাতায় নগর উন্নয়নের প্রয়োজনে, পাতাল রেল প্রকল্পের কাজে এবং তেলের সন্ধানে বহু ভূতাত্বিক সমীক্ষা হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন স্থানের নলকূপের লগ থেকেও কলকাতার ভূতত্ব জানা গিয়েছে বিশদ ভাবে।

কলকাতার ভূগর্ভের ভূতত্ব মোটামুটি ভাবে প্রায় তিনশ মিটার গভীরতা পর্যন্ত জানা গিয়েছে। কলকাতার সবটাই ব-দ্বীপ অঞ্চলের পলি। এর উপরিভাগে রয়েছে প্রায় ২০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত কর্দমের স্তর। তারপর কয়েক মিটার পুরু মিহি বালির স্তর। তারপর আবার কর্দমের স্তর। এই দ্বিতীয় কর্দমের স্তরের নীচে রয়েছে মিহি, মাঝারি ও মোটা বালুর স্তর যা প্রায় ১২০ থেকে ১৪০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দ্বিতীয় বালুর স্তরের নীচে আবার কর্দম আছে। তার নীচে আবার বালির স্তর রয়েছে। এই ভাবে কলকাতার ভূগর্ভে কোথাও দুটি কোথাও বা তিনটি বা তার বেশী বালুকার স্তর পাওয়া যায়। কলকাতার উত্তরে একটি বালুকার স্তরই ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। মধ্যে কোথাও কোথাও কোনও কর্দমের স্তর নেই। তা হলে দেখা যাচ্ছে কলকাতায় একটি, দুটি বা তিনটি বালুকার স্তর রয়েছে, যেই স্তরে জল আছে। কলকাতার নলকূপ গুলো এই তিনটি স্তর থেকেই জল উত্তোলন করে। কিন্তু তিনটি স্তর কর্দমের স্তর দিয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় এবং প্রতিটি স্তরের দানার আকৃতি, সান্ধ্রতা ও পরিবাহিতা আলাদা থাকায় বিভিন্ন ক্ষমতার নলকূপ বিভিন্ন স্তরে বসানো আছে।

কোলকাতার একেবারে দক্ষিণ অংশে, অর্থাৎ বাঁশদ্রোণী,গড়িয়া, নাকতলা, ব্রহ্মপুর, পূর্ব পুঁটিয়ারি অঞ্চলে মানুষ তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই জলের চাহিদা মেটাতে নলকূপ বসিয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই মানুষেরা প্রথম ভৌমসলিলাধারকেই বেছে নিয়েছিলো। এবং এই উপরিভাগের সলিলাধারটি সবচেয়ে বেশী শোষিত হয়েছে। কলকাতায় যখন থেকে বহুতল বাড়ি তৈরী শুরু হল তখন থেকেই জলের চাহিদা এক নতুন মাত্রা নিল। বহুতল বাড়ির ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কর্পোরেশনের জলের উপর নির্ভর করে তার চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়। কারণ আগে যতটা ভূমির ওপর একটা পরিবার বাস করতো এখন সেই ভূমিতে অনেক গুণ বেশী পরিবার বাস করছে। তার জন্য আরও জলের যোগান দিতে সেই সব বাড়িতে গভীর নলকূপ বসানো শুরু হল। এর ফলে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সলিলাধার থেকে জল তোলা শুরু হল। খুব অল্প জায়গায় ঘন ঘন নলকূপ বসিয়ে জল তোলা শুরু হল। কলকাতা পৌরসভাও এই দুই সলিলাধারে প্রচুর

স্বল্প ও মাঝারি ক্ষমতার নলকূপ বসিয়ে জল তোলে। কলকাতার দক্ষিণ অংশে করপোরেশনের জ্ল সরবরাহের অনেকটা ভার এই নলকূপ গুলি বহন করে।

ইতি পূর্বে যে সব সমীক্ষা হয়েছে তার থেকে এটা জানা যচ্ছে যে আর্সেনিক রয়েছে সলিলাধারের মধ্যেই এবং সলিলাধারের ওপরে বা নীচে কর্দমের স্তরে অসংখ্য পকেটের মধ্যে। এই বালু অথবা কর্দমের কণার সাথে অর্সেনিকের যৌগটি বা যৌগ গুলি, তা আর্সেনিক সালফাইড, অক্সাইড, বা হাইড্রোক্সাইড হতে পারে, খুব সূক্ষ মাত্রায় যুক্ত হয়ে আছে। অতিরিক্ত জল উত্তোলনের ফলে জলস্তর নেমে যাচ্ছে এবং আর্সেনিকের পকেটগলিতে রাসায়নিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। যার ফলে আর্সেনিক জলের সাথে মিশে ক্রমশ: নলকূপগুলির ফিল্টারের কাছাকাছি চলে আসছে। এ ছাড়া আরও একটি তত্ত্ব আছে তা হল এই পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে এক ধরণের ব্যাকটিরিয়া আর্সেনিককে জলে দ্রবীভূত হত সাহায্য করছে।

কলকাতার ক্ষেত্রে আরও একটি ব্যাপার আছে। তা হল কলকাতার আদিগঙ্গার দুই তীরে নলকূপ গুলিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি। এই এলাকার সলিলাধার গুলি মূলত: গঙ্গারই পলি। আদিগঙ্গা প্রকৃতপক্ষে ভাগীরথীরই পুরাতন প্রবাহ। দেখা যাচ্ছে যে আদিগঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চল প্রকৃতপক্ষে আর্সেনিক দূষিত এলাকা। আদিগঙ্গার আশেপাশেই আর্সেনিকের আধিক্য বেশী। এর থেকে আরও একটা সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে, তা হল কলকাতার ক্ষেত্রে এই আদিগঙ্গাবাহীত পলিই এই আর্সেনিকের প্রধান আশ্রয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রস্তাব

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আর্সেনিকের মোকাবিলায় যে ২০ টি পদক্ষেপের প্রস্তাব রেখেছেন তা নীচে দেওয়া হল ঃ

১) আর্সেনিকোসিস রুগী ও বিপদের সম্মুখীন রুগীদের সনাক্ত করা।
২) রুগীদের পুষ্টিকর খাবার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
৩) স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিতে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও ওষুধের ব্যবস্থা করা
৪) বিভিন্ন অনুদান প্রদানকারী সংস্থার সহযোগিতায় আঞ্চলিক ভাবে আর্সেনিক নির্ধারণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ
৫) বিকল্প নিরাপদ জলের ব্যবস্থা করা
৬) আর্সেনিকোসিস রুগী চেনার জন্য এবং তার মোকাবিলা করার জন্য স্বাস্থ্য কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
৭) জনগণকে জল ও স্বাস্থ্য সচেতন করার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা
৮) অনুদানকারী সংস্থার সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে নিবিড় সমীক্ষার ব্যবস্থা করা
৯) দুই দেশের মধ্যে তথ্য বিনিময় করা
১০) জাতীয় স্তরে আর্সেনি সমস্যা নিয়ে ডাটাবেস গঠন করা
১১) বিভিন্ন আর্সেনিক দূরীকরণ পদ্ধতির কার্যকারীতা খতিয়ে দেখা
১২) স্থানীয় সমস্যার মোকাবিলায় উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন

১৩) কি ধরণের প্রশিক্ষণের প্রয়োজন তা স্থির করা

১৪) পানীয় জলের গুণাগুণ পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলা

১৫) আর্সেনিকোসিস রুগীদের নিয়মিত নিরীক্ষণ করার জন্য উপযুক্ত সংগঠন গড়ে তোলা

১৬) মানবদেহে এবং জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি নির্ণয় ও মূল্যায়ণের জন্য জাতীয় পর্যায়ে রেফারেন্স পরীক্ষাগার গড়ে তোলা

১৭) আর্সেনিক দূষণ ও তার বিপদ কমানোর জন্য সব রকমের গবেষণার জন্য উপযুক্ত সমর্থন সৃষ্টি করা

১৮) প্রয়োজনীয় অর্থের পরিকল্পনা করা

১৯) বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের পারস্পারিক সহযোগিতায় যুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ ও অভিজ্ঞতার বিনিময় করা

২০) সমস্যার মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক স্তরে সহযোগিতার ভিত্তি সবল করা

তথ্য সূত্র

Arsenic contamination of Bangladesh paddy field soils: implications for rice contribution to arsenic consumption. Meharg AA, Rahman MM. Environ Sci Technol 2003 Jan 15;37(2):229-34.

Arsenic groundwater contamination and sufferings of people in North 24-Parganas, one of the nine arsenic affected districts of West Bengal, India. Mohammad Mahmudur Rahman, Badal Kumar Mandal, Tarit Roy Chowdhury, Mrinal Kumar Sengupta, Uttam Kumar Chowdhury, Dilip Lodh, Chitta Ranjan Chanda, Gautam Kumar Basu, Subhash Chandra Mukherjee, Kshitish Chandra Saha, Dipankar Chakraborti. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 2003 38(1), ***Arsenic groundwater contamination in Middle Ganga Plain, Bihar, India - a future danger?*** Chakraborti, Dipankar, Subhash C. Mukherjee, Shyamapada Pati, Mrinal K. Sengupta, Mohammad M. Rahman, Uttam K. Chowdhury, Dilip Lodh, Chitta R. Chanda, Anil K. Chakraborti, and Gautam K. Basu. Environmental Health Perspectives 2003, in press

Arsenic in Australian environment - an overview. E. Smith, J. Smith, L. Smith, T. Biswas, R. Correll, R. Naidu. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 2003 38(1), 223 – 239

Arsenic in drinking water and skin lesions: dose-response data from West Bengal, India. Haque R, Mazumder DN, Samanta S, Ghosh N, Kalman D, Smith MM, Mitra S, Santra A, Lahiri S, Das S, De BK, Smith AH. Epidemiology 2003 Mar;14(2):174-82.

Arsenic in plant-soil environment in Bangladesh. M. Ashraf Ali, A. B. M. Badruzzaman, M. A. Jalil, M. Delwar Hossain, M. Feroze Ahmed, Abdullah Al Masud, Md. Kamruzzaman and M. Azizur Rahman. In: Fate of Arsenic in the Environment, Proceedings of the BUET-UNU International Symposium, 5-6 February 2003, Dhaka, Bangladesh.

Arsenic-induced dysfunction in relaxation of blood vessels. Moo-Yeol Lee,Byung-In Jung, Seung-Min Chung, Ok-Nam Bae, Joo-Young Lee, Jung-Duck Park, Ji-Sun Yang, Hyomin Lee, and Jin-Ho Chung. Environmental Health Perspectives Supplements 111(4), April 2003.

Biogenic arsenopyrite in holocene peat sediment, India. Anjum Farooqui, and Usha Bajpai. Ecotoxicology and Environmental Safety 55(2), June 2003, 157-161.

Chronic arsenic toxicity: clinical features, epidemiology, and treatment: experience in West Bengal. D. N. Guha Mazumder. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 2003 38(1), 141 – 163

Diagnosis of arsenicosis. Kshitish Chandra Saha. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 2003 38(1), 255 - 272.

A dugwell program to provide arsenic-safe water in West Bengal, India - preliminary results. Meera M. Hira Smith, Timir Hore, Protap Chakraborty, D. K. Chakraborty, Xavier Savarimuthu, Allan H. Smith. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 2003 38(1), 289 – 299

The ecology of arsenic. Ronald S. Oremland and John F. Stolz. Science 300(9), 939-944.

Effects of using arsenic-iron sludge in brick making. Md. Abdur Rouf and Md. Delwar Hossain. In: Fate of Arsenic in the Environment, Proceedings of the BUET-UNU International Symposium, 5-6 February 2003, Dhaka, Bangladesh

Fate of arsenic in wastes generated from arsenic removal units. M. Ashraf Ali, A. B. M. Badruzzaman, M.

Fighting arsenic at the grassroots: experience of BRAC's community awareness initiative in Bangladesh. Health Policy Plan 2003

Food chain aspects of arsenic contamination in Bangladesh - effects on quality and productivity of rice. J. M. Duxbury, A. B. Mayer, J. G. Lauren, N. Hassan. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 2003 38(1), 61 – 69

Groundwater arsenic contamination, its health impact and mitigation program in Nepal Roshan R. Shrestha, Mathura P. Shrestha, Narayan P. Upadhyay, Riddhi Pradhan, Rosha Khadka, Arinita Maskey, Makhan Maharjan, Sabita Tuladhar, Binod M. Dahal, Kabita Shrestha. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 2003 38(1), 185 – 200

Hair and toenail arsenic concentrations of residents living in areas with high environmental arsenic concentrations. Andrea L. Hinwood, Malcolm R. Sim, Damien Jolley, Nick de Klerk, Elisa B. Bastone, Jim Gerostamoulos, and Olaf H. Drummer. Environ Health Perspect 111:187-193

laboratory case identification of arsenic in Ronpibul village, Thailand (2000-2002). Sumol Pavittranon, Kwanyuen Sripaoraya, Staporn Ramchuen, Sirinmas Kachamatch, Wilaiwan Puttaprug, Narong Pamornpusirikul, Siriluck Thaicharuen, Sutee Rujiwanitchkul, Winai Walueng. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 2003 38(1), 213 - 221.

Magnitude of arsenic toxicity in tube-well drinking water in Bangladesh and its adverse effects on human health including cancer: evidence from a review of the literature. Khan MM, Sakauchi F, Sonoda T, Washio M, Mori M. Asian Pac J Cancer Prev 2003 Jan-Mar;4(1):7-14.

Millions more at risk of arsenic poisoning than previously thought. Sanjay Kumar. British Medical Journal 2003;326:466 (1 March).

Neuropathy in arsenic toxicity from groundwater arsenic contamination in West Bengal, India. Subhash Chandra Mukherjee, Mohammad Mahmudur Rahman, Uttam Kumar Chowdhury, Mrinal Kumar Sengupta, Dilip Lodh, Chitta Ranjan Chanda, Kshitish Chandra

Saha, Dipankar Chakraborti. Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 2003 38(1), 165 – 183

Non-cancer effects of chronic arsenicosis in Bangladesh - preliminary results. Abul Hasnat Milton, Ziaul Hasan, Atiqur Rahman, Mahfuzar Rahman Journal of Environmental Science and Health, Part A-Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 2003 38(1), 301 – 305

Searching for an optimum solution to the Bangladesh arsenic crisis. Caldwell BK, Caldwell JC, Mitra SN, Smith W. Soc Sci Med 2003 May;56(10):2089-96.

The spatial pattern of risk from arsenic poisoning - a Bangladesh case study. M. Manzurul Hassan, Peter J. Atkins, Christine E. Dunn. Journal of Environmental Science and Health, Part A- Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, 2003 38(1), 1 – 24

Survey of arsenic and other heavy metals in food composites and drinking water and estimation of dietary intake by the villagers from an arsenic-affected area of West Bengal, India. Roychowdhury T, Tokunaga H, Ando M.

Arsenic accumulation and metabolism in rice (Oryza sativa L.). Abedin, M.J., Cresser, M.S., Meharg, A.A., Feldmann, J., and Cotter-Howells, J. Environmental Science and Technology (2002), 36:962-968

Arsenic contamination in Bangladesh groundwater: a major environmental and social disaster. Alam M.G.M.; Allinson G.; Stagnitti F.; Tanaka A.; Westbrooke M.. International Journal of Environmental Health Research, 1 September 2002, 12(3), pp. 235-253.

Arsenic contamination in groundwater: some analytical considerations. David G. Kinniburgh, Walter Kosmus. Talanta 58 (2002) 165-180

Arsenic contamination of groundwater in West Bengal (India): build-up in soil-crop systems. S. K. Sanyal and S. K. T. Nasar. Paper presented to the International Conference on Water Related Disasters held in Kolkata on 5-6 December 2002.

Arsenic contamination in Hizla, Bangladesh - sources, effects, and remedies. A. S. M. Kamal and Preeda Parkpian. ScienceAsia, Vol. 28. No. 2, pp 181-189, 2002.

Arsenic contamination of Bangladesh paddy field soils: implications for rice contribution to arsenic consumption. Meharg A.A. and Rahman M.M., 2003. Environ. Sci. Technol., 37 (2), 229 –234

Arsenic contamination of the environment- a new perspective from central-east India. Piyush Kant Pandey, Sushma Yadav, Sumita Nair, Ashish Bhui. Environment International 28 (2002) 235-245.

Arsenic in subsurface water: its chemistry and removal. SenGupta, A.K. and Greenleaf, J.E., 2002. In: Environmental Separation of Heavy Metals (Ed. A. K. SenGupta), 265-306. Lewis Publishers, A CRC Press Co., Boca Raton, FL.

Arsenic removal by reverse osmosis. Robert Y. Ning. Desalination 143 (2002) 237-241

Arsenic removal from water using advanced oxidation processes. Zaw, Myint, and Maree T. Emett. Toxicology Letters, 133(1), 7 July 2002, 113-118.

As(III) removal from groundwaters using fixed-bed upflow bioreactors. I. Katsoyiannis, A. Zouboulis, H. Altho, H. Bartel. Chemosphere 47 (2002) 325-332

Combined effects of anions on arsenic removal by iron hydroxides. Xiaoguang Meng, George P. Korfiatis, Sunbaek Bang, Ki Woong Bang. Toxicology Letters Toxicology Letters Volume 133, Issue 1, 7 July 2002, Pages 103-111

Effectiveness and reliability of arsenic field-testing kits: are the million dollar screening projects effective or not? Mohammad Mahmudur Rahman, Debapriyo Mukherjee, Mrinalkumar Sengupta, Uttam Kumar Chowdhury, Diliplodh, Chittaranjanchanda, Shibtoshroy, Md. Selim, Quazi Quamruzzaman, Abul Hasnat Milton, S. M. Shahidullah, Md. Tofizurrahman, and Dipankar Chakraborti, 2002. Environmental Science & Technology, 36(24), 5385-5394

A field based evaluation of household arsenic removal technologies for the treatment of drinking water. Sutherland D, Swash PM, Macqueen AC, McWilliam LE, Ross DJ, Wood SC. Environ Technol 2002 Dec;23(12):1385-403

An overview of arsenic contamination in groundwater of Nepal and its removal technologies at household level. Amar Neku and Nirmal Tandukar. Paper presented on Environment Day (5 Jun) 2002.

Removal of arsenic from contaminated water sources by sorption onto iron-oxide-coated polymeric materials. Ioannis A. Katsoyiannis, Anastasios I. Zouboulis. Water Research 36 (2002) 5141-5155

Respiratory effects and arsenic contaminated well water in Bangladesh. Milton AH, Rahman M. Int J Environ Health Res 2002 Jun;12(2):175-9.

A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in natural waters. P.L. Smedley, D.G. Kinniburgh. Applied Geochemistry 17 (2002) 517-568

Role of iron in controlling speciation and mobilization of arsenic in subsurface environment. Purnendu Bose and Archana Sharma. Water Research, in press Water Res 2002 Nov;36(19):4916-26

Searching for an optimum solution to the Bangladesh arsenic crisis. Bruce K. Caldwell, John C. Caldwell, S.N. Mitra, and Wayne Smith. Social Science & Medicine

Arsenic contamination in groundwater, Murshidabad district, West Bengal. D. Chandrasekharam, J. Karmakar, Z. Berner and D. Stüben. Water-Rock Interaction-10, Proceed. Villasimus, Italy, June 10-15, 2001

Arsenic contamination of ground and pond water and water purification system using pond water in Bangladesh. H. Yokota, K. Tanabe, M. Sezaki, Y. Akiyoshi, T. Miyata, K. Kawahara, S. Tsushima, H. Hironaka, H. Takafuji, M. Rahman, Sk.A. Ahmad, M.H.S.U. Sayed, and M.H. Faruquee. Engineering Geology, Vol. 60 (1-4) (2001) pp. 323-331

Arsenic crisis in Indian subcontinent: local solution to a global problem. SenGupta, A.K., Gupta, A. and Deb, A., 2001. Water 21: IWA Magazine, December, 2001: 34-37.

Arsenic groundwater contamination and sufferings of people in West Bengal-India and Bangladesh. Chowdhury, U. K., B.K. Biswas, T. Roy Chowdhury, B. K. Mandal, G. Samanta, G. K. Basu, C.R. Chanda, D. Lodh, K. C. Saha, D. Chakraborti, S.C. Mukherjee, S. Roy, S. Kabir, Quamruzzaman. In: Trace Elements in Man and Animal, Publisher: Plenum Publishing Corporation, New York.

Arsenic poisoning in groundwater - health risk and geochemical sources in Bangladesh. H.M. Anawara, J. Akaib, K.M.G. Mostofac, S. Safiullahd, S.M. Tareqd. Environment International 27 (2002) 597-604

Arsenic pollution of groundwater in Bangladesh. Kimiko Tanabe, Hiroshi Yokota, Hiromi Hironaka, Sachie Tsushima, Yoshihiro Kubota. Applied Organometallic Chemistry April 2001, 15(4) 241-251

Arsenic removal during conventional aluminium-based drinking-water treatment. Jan Gregor, Wat. Res. 35(7)1659-1664

Arsenic removal from contaminated water by the Soyatal Formation, Zimapán Mining District, Mexico - a potential low-cost low-tech remediation system. Ongley L.K.; Armienta M.A.; Heggeman K.; Lathrop A.S.; Mango H.; Miller W.; Pickelner S. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, February 2001, vol. 1, no. 1, pp. 23-31(9).

Prevention of endemic arsenism with selenium. Wang Wuyi, Yang Linsheng, Hou Shaofan, Tan Jian'an and Li Hairong. Current Science, Vol. 81, No. 9, 10 November 2001 1215-1218

Treatment of arsenic in Bangladesh well water using a household co-precipitation and filtration system. Xiaoguang Meng, George P. Korfiatis, Christos Christodoulatos and Sunbaek Bang. Water Research 2001, 35(12) 2805-2810.

Arsenic-induced skin lesions among Atacameno people in Northern Chile despite good nutrition and centuries of exposure. Smith A.H.; Arroyo A.P.; Guha Mazumder D.N.; Kosnett M.J.; Hernandez A.L.; Beeris M.; Smith M.M.; Moore L.E. Environmental Health Perspectives, 108(7), 617-620.

Arsenic in Groundwater from Southern West Bengal: Influence of Holocene Deltaic sedimentation and biogeochemical reduction process. S. K. Acharya, Workshop on Arsenic Hazards in Groundwater of West Bengal- Steps for Ultimate Solution, Kolkata 2002

Arsenic Contamination in Groundwater from Shallow Aquifer of Gangetic Delta- Suggestions for Remidy, S. Sengupta, P. K. Mukherjee & T. Pal Workshop on Arsenic Hazards in Groundwater of West Bengal- Steps for Ultimate Solution, Kolkata 2002

Concerning Arsenic Hazards Groundwater in West Bengal, G. S. Ghatak and R. P. Chandra, Workshop on Arsenic Hazards in Groundwater of West Bengal- Steps for Ultimate Solution, Kolkata 2002

Arsenic Polution in Groundwater of West Bengal, K. Shivanna et.al., Workshop on Arsenic Hazards in Groundwater of West Bengal- Steps for Ultimate Solution, Kolkata 2002

Role of School of Tropical Medicine, Kolkata, Control of Arsenic Problem in West Bengal , G.Poddar, et.al.,Workshop on Arsenic Hazards in Groundwater of West Bengal- Steps for Ultimate Solution, Kolkata 2002

Technology Park on Arsenic Removal Plants: An Active Awareness of Problems of Arsenic Removal from Ground-Water and Mitigatigation Biplab B. Basu, Workshop on Arsenic Hazards in Groundwater of West Bengal- Steps for Ultimate Solution, Kolkata 2002

Community Based Projects to Mitigate Arsenic Polution in West Bengal , Dr. P. H. Ananthanarayanan and Prof. A Majumdar,Workshop on Arsenic Hazards in Groundwater of West Bengal- Steps for Ultimate Solution, Kolkata 2002

Technologies of Water Treatment for Arsenic Removal , B. Achari,Workshop on Arsenic Hazards in Groundwater of West Bengal- Steps for Ultimate Solution, Kolkata 2002

Arsenic Removal from Groundwater , G.S. Ghatak., Technology brochure on Arsenic Mitigation Programme Technology Park for Arsenic Removal, Kolkata 2001

Arsenic: Historical Perspective , Jose M. Azcue & Jerome O. Arsenic in the Environment Part I, John Willy & Sons Inc. 1994

Arsenic MobiliZation and Bioavailibility in Soils, D. K. Bhumbla and R. F. Keefer Arsenic in the Environment Part I, John Willy & Sons Inc. 1994

Arsenic Distribution in Soils, Huang Yan-Chu, Arsenic in the Environment Part I, John Willy & Sons Inc. 1994

Arsenic in Human Medicine, Michael S. Gorby, Arsenic in the Environment Part II, John Willy & Sons Inc. 1994

A Review of Arsenic HaZards to Plants and Animals with Emphasis on Wildlife Resources, Ronald Eisler, Arsenic in the Environment Part II, John Willy & Sons Inc. 1994